আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স, লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স, লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চিত্রশিল্পী :
শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ
শ্রীশৈল চক্রবর্তী
শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার

প্রচ্ছদ :
শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ

তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৫৮

মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিমিটেড
পি ১৬ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

আপনাকে দিলাম

এই লেখকের

মেয়েদের মন

মনের মত বৌ

পাত্রপাত্রী-সংবাদ

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

যখন তারা কথা বলবে

প্রেমের বি-চিত্র গতি

প্রেমের প্রথম ভাগ

প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ

শিবরামের সেরা গল্প

দেবতার জন্ম

আমার লেখা

ইত্যাদি

এই বইয়ের বেশির ভাগ লেখা সাপ্তাহিক দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরুনো। ঐ দুই পত্রিকার সৌজন্যে পাওয়া এর ছবিগুলির জন্য আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

ঢাকায় আমাদের সব কিছুই খোলাখুলি। এমন কি, ঐ খুন-খারাপিও। এই তো সেদিন, ছোটখাট একটা দাঙ্গা হয়ে গেল—সকলের চোখের ওপরেই। কোনো ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় নেই।

(বলা দরকার, আমার এই কাহিনীটা নেহরু-লিয়াকৎ-ঘটনার আগেকার। কিম্বা, নেহরু-লিয়াকৎ-কাহিনীর আগের দুর্ঘটনা—এভাবেও বলা যায়।)

আমি তখন ঢাকায়।

হাতে কোনো কাজ না থাকলে দাঙ্গা বাধানোই এখানকার ফ্যাসান। সেই সনাতন পরার্থপরতা—খুড়োর গঙ্গাযাত্রার। তবে স্মরণ রাখবেন, পরের খুড়োর—নিজের চাচার নয়।

ব্যাপারটা এমন কিছুই অস্বাভাবিক নয় এখানে। হৈ-চৈ করবার মতও না। সেকালের নবাবদের শহর—সাবেকী আমলের সেই ঠাট সবই বজায় রয়েছে এখনো। কথায় কথায়—'শির্ লাও!' সেকেলে নবাবী ঠাট্টা।

অতএব, দাঙ্গা ঘটেই। মাঝে মাঝেই ঘটে। তাহলেও তা নিয়ে হাঙ্গামা করার মতো কিছু নেই। কেননা, তা সত্ত্বেও দুটো দাঙ্গার মাঝামাঝি ভালোই কাটে আমাদের। দাঙ্গাতেও নেহাৎ মন্দ কাটে না। কচুর মতই কেটে যায়। সেই জন্যেই আমরা বলি, দাঙ্গা না কচু! আর, তার পরেও কাটে বেশ। দাঙ্গা করেও—(বলা উচিত, কৃত হয়েও) তারপরেও আমরা চাঙ্গা থাকি। প্রচুর দুধ, মাছ, ডিম—ইস্‌লাম আর ইলিশ। হজম করতে হিম্‌শিম্ খেতে হয়।

তাছাড়া, দাঙ্গাটাকেও খাপিয়ে নেয়া যায়। অকুদিনে অকুস্থানে না থাকলেই চলে,—তাহলেই মিটে যায়। ঢাকাই বন্ধুরা আগেভাগেই

আপনি কী হারাইতেছেন

জানিয়ে দেন—ওহে চকর্‌বর্‌তি, অমুক দিনের এ সময়ে এ পথে বেরিয়ো না। এসো না এ মহল্লায়। সেদিন আমাদের একটু—ইয়ে, কী বলে গিয়ে—এই একটু হল্লা-টল্লা আছে।

ব্যস্, তাহলেই হয়। দয়া করে তাঁরা জানান্ দিলেই বেঘোরে আর জানটা দিতে হয় না এবং দেখেছি, কী নির্ভুল ওঁদের দিনক্ষণ। আর কী আশ্চর্য পাংচুয়ালিটি। যদি সকাল সাতটায় দাঙ্গা বাধার কথা থাকে, তাহলে যতই ঘনঘটা হোক না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব সেরেসুরে নাস্তার সময় সবাই মজুদ। অদ্ভুত Show-শৃঙ্খলা, দাঙ্গা করেও কাউকে নাস্তানাবুদ হতে হয় না।

এখন, সেদিনের কথা বলি। বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি, খাচ্ছি, হঠাৎ মনে হোলো আবহাওয়া কেমন যেন! দুপাশের দোকান-পসারের ঝাঁপ ফেলা। মুসলমানী চা-খানাগুলি খোলা কেবল। একটা পাঠান পুলিস আমার পাশ দিয়ে চলে গেল গা ঘেঁষে, বাঁশের মোটা লাঠি হাতে। হাবভাবে বেশ ব্যস্ততাই।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে গলির পথ ধরলাম। গলিটা ফাঁকা। বাসিন্দারা সব গেল কোথায়? অন্য পাড়ায় বিষয়কর্মে নাকি? সুধু এক ভদ্রলোককে দেখতে পাওয়া গেল—একজনমাত্র গোটা গলিটায়। পরণে সিল্কের লুঙ্গি, বুশ্ সার্ট গায়, হাতে আধখানা ইঁট। আমাকে দেখে কি করবেন, তিনি ভাবতে লাগলেন।

ইঁটটা ছাড়বেন, না, ছুঁড়বেন বোধহয় এই ছিল তাঁর ভাবনা। ঠাহর পাচ্ছিলেন না ঠিক—আমাকে দেখে।

আমারও তথৈবচ। কি করবো আমিও ভেবে পাচ্ছিনে।

আপনি জানেন না !

দুজনেই আমরা ইতস্তত করি। দুদিক দিয়ে। আমি পায়ের দিকে —তিনি হাতের দিকে। পালাবার পথ-টথ আছে কি না আমি তাকাই। ইঁটটা তাক্ করবেন কি না তাঁর সমস্যা।

'সালাম্ আলেকম্।' আমি বল্লাম। অগত্যা।

'আলেকম্ সালাম্।' তিনি হাঁপ ছেড়ে হাত নামালেন। তাঁর ইঁটোদ্যত হাত।

কিন্তু তাঁকে তেমন খুশি দেখা গেল না। কেমন যেন মন-মরাই দেখলাম। মনে হোলো, ইঁট না হলেও কি যেন তাঁর হাত হতে ফসকেছে।

'আপনি কি কাউকে খুঁজ-ছিলেন?' ভদ্রতার খাতিরে শুধাতে হোলো আমায়।

'অ্যাঁ—হ্যাঁ! না, ঠিক তা নয়।.....' তাঁর একটু আম্‌তা আম্‌তা শুনি: 'ঠিক খুঁজছি না। মানে, খুঁজছি বটে, তবে বিশেষভাবে কাউকে নয়..... মানে, এই.....'

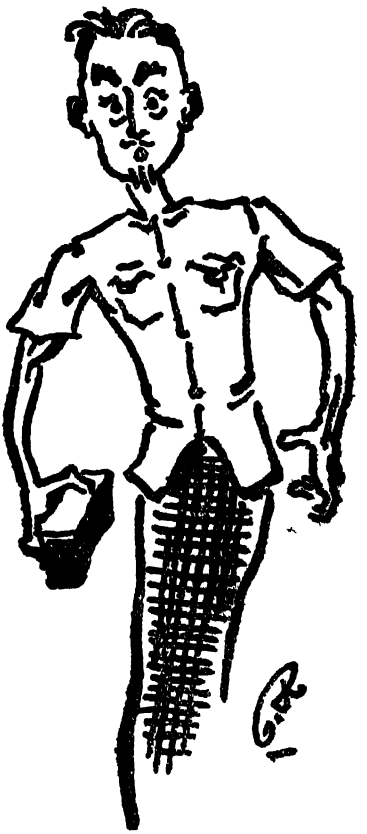

ইঁটটা ছাড়বেন, না ছুঁড়বেন?

আপনি কী হারাইতেছেন

'বুঝেচি।' আজকের দাঙ্গাটা আপনার মাঠে মারা গেল। কাউকে মারতে পারেন নি—তাই না?'

'তাই বটে। দুপুরের খানাপিনার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'এখন উঠে দেখছেন বিল্‌কুল খতম্?'

আমার জবাবে তাঁর গলা থেকে অর্দ্ধস্ফুট একটা অব্যয়-ধ্বনি বেরুলো। হতে পারে সেটা কোনো উর্দু জবান, আমার জানা নেই।

আমি আর তাঁকে কী সান্ত্বনা দিতে পারি? একমাত্র বাস গাত্র হতে দেয়া যায়, কিন্তু তন্মাত্র প্রাণ সেই দৃষ্টান্তে দিতে যাওয়া একটু যেন মাত্রাধিক্য হয় না? তাছাড়া, বুদ্ধ-যুগের এতকাল পরে এই বুদ্ধির যুগে এসে অমন দানশীলতা কেমন যেন বেখাপ্‌পা লাগে।

অগত্যা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলি—'আমি—আমি সত্যিই ভারী দুঃখিত। কাফের না হতে পারাব জন্য লজ্জিত আমি খুবই। নইলে কখনই আমি

আপনার ঐ ইটখানা বরবাদ হতে দিতাম না। আমার দ্বারাই আপনার বেহেস্তে যাবার পথ পরিষ্কার হতে পারতো…'

'ইয়াল্লা! বলবেন না, বলবেন না।' তিনি ডুক্‌রে উঠলেন—'ওকথা বলবেন না। খোদার কুদ্‌রতে দুজনেই আমরা বেঁচে গেছি আজ। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণই আপনার। আমি বুঝতেই পারি নি গোড়ায়। আর, কি করেই বা বুঝবো? লুঙ্গি না পরে বাঙালীদের মতন ধুতি-

পাঞ্জাবী পরে বেরিয়েছেন। যাক্, যেতে দিন। একটুর জন্যেই কী ভীষণ গুনাহ্‌র হাত থেকে বেঁচে যাওয়া গেছে।'

'সে আপনার নিজগুণে।' আমি বলি, তার বেশি আর কিছু বলি না। বলতে পারি না।

কিন্তু না বল্লেও, অকথিত বেদনায় আমার হৃদয় গুম্‌রায়। হাতে আধখানা ইঁট, দাঙ্গাহীন পাকিস্থানী—এ দৃশ্য অবর্ণনীয়। চোখ মেলে এমনটা দেখা যায় না। হতে পারেন উনি কোনো আন্সার—আন্সার-বাহিনীরই কেউকেটা একজন; কিন্তু ওঁকে আমার কাছে একটি অংশ বলেই মনে হয়। আমার প্রশ্নের আন্‌সার্ নয়।

ইটহস্ত দাঙ্গাভ্রষ্ট এবং হৃতবেহেস্ত এই জনাবকে আমি কোন্ ভাষায় সান্ত্বনা জানাবো?

'এর মধ্যেই কি সব হাঙ্গাম্ শেষ হয়ে গেছে?' আমি জিগেস্ করি: 'রম্‌নার ওদিকটায় চল্‌ছে বোধহয় এখনো? কিম্বা কুমিতলার দিকে—?'

'কুমিতলায় আমার কী? আমাদের কী?' উনি উসকে ওঠেন: 'ও তো যতো গুণ্ডাদের—ছোটলোকদের ব্যাপার। পাঠানদের কাজ।' মুখ বেঁকিয়ে তিনি বলেন।

'যা বলেছেন।' আমায় বলতে হয়।—'আপনি বুঝি দপ্তরখানার ভদ্র দাঙ্গায় ভিড়তে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ'—সায় দিলেন তিনি—'ধরেছেন ঠিক।'

'কিন্তু সে দাঙ্গা তো, যদ্দূর জানি, দুটোর আগেই ফিনিশ্ হয়ে গেছে.....'

'আমারো তাই মালুম। ঘুমিয়েই সব মাটি করেছি আজকে।' মলিন হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

'তাহলে? তাহলে আর কী হবে? আসুন, ততক্ষণ এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্।' আমার আমন্ত্রণ জানাই।

ভদ্রলোককে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল সত্যিই। ভদ্রলোকেরো কম কষ্ট হচ্ছিল না। থান্-ইঁট হাতে নাহক্ ঘুরে বেড়ানো কি কম হয়রানি? দেখতেও খুব সুচারু নয়।

'চলুন তাই।' ইঁটখানার হাত বদলে তিনি বল্লেন।

চাখানায় গিয়ে ঢুকলাম দুজনায়।

যেমন গোল তেমনি কি ভীড় সেই আড্ডায়? ঝক্‌ঝকে ছোরার সঙ্গে খাপ্ মেলানো চক্‌চকে চোখ—চারধারেই চাকচিক্য। আর ঢাকাই বাঙলায় কথা বললে কি হয়, সকলেই তারা তৈমুরলং! ঔরংজেবের বংশধর এক একটি। মোগল কিম্বা পাঠান। কিম্বা পাঠান আর মোগলের থেকে মাঠান্ বাদ দিলে যা দাঁড়ায়—পাগল।

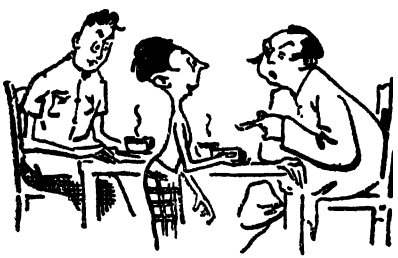

হাতিয়ার বেহাত

সেই মোগোলো যোগের মাঝখানে গিয়ে বসলাম আমরা—নজর বাঁচিয়ে সকলের।

বাচ্চাটা দু'পেয়ালা চা নিয়ে এলো।

আমি ইঁটখানা তার হাতে দিয়ে বল্লাম—'ছাখো হে, এটি তোমাদের মালখানায় নিয়ে মজুদ রাখো। ইঁট নয়, এঁর হাতিয়ার। বুঝেচো? দেখো যেন হারায় না, কি, আর কেউ না হাতায়। হুঁসিয়ার।'

ছেলেটি দ্বিরুক্তি না করে ইটখানা ক্যাশে নিয়ে গিয়ে জমা দিলো, তার মালিকের জিম্মায়।

চা-পানের শেষে তিনি বল্লেন—'চলুন, আপনার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

আমি না করলাম না। যে বাসায় উঠেছিলাম, সেটা থানার পাশেই। পাকিস্থানা হলেও নিরাপদ এলাকাই। আঠারো আনাই নির্বিপাক। তাহলেও থানার কাছে গিয়ে পৌঁছানোর আগেই অধমের মাথায় থান্-ইটের এক-আধখানা এসে পৌঁছতে পারে তো? সেই হিসেবে, আত্মরক্ষার দায়ে যেমন রোগের টীকা নিতে হয়, তেমনি দাঙ্গার এই জ্যান্ত জীবাণুটিকে সঙ্গে রাখলে হয়তো বা অযাচিত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচা যায়।

'কষ্ট করে যাবেন অদ্দূর?' বলি আমি তবুও।

'না, চলুন। লুঙ্গি পরে না বেরিয়ে যা ভুল করেছেন। মনে রাখবেন আমাদের মহমেডান স্পোর্টিংও এসব কাণ্ডে ওদের মোহনবাগানের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না···সেম্‌সাইড গোল্ হয়ে যেতে পারে।'

'তা বটে।' আমি ঘাড় নাড়ি—'তা তো হতেই পারে।'

'তাছাড়া ঐ—ঐ পাঠানদের মশাই একটুও বিশ্বাস নেই·····' বলতে গিয়ে, কী ভেবে তিনি চেপে যান হঠাৎ।

'এই জন্যেই তো জনাব, আমাদের উর্দী পরা উচিত।' আমিও গায়ে পড়ে বলি: 'আগে উর্দী পরুন, তারপর উর্দু পড়ুন।'

'হ্যাঁ, ঐ উর্দুতেই সারবে আমাদের।' আর তিনি চাপেন না, চাপতে পারেন না—'উর্দু আর ঐ সিন্ধিওয়ালারাই।'

আপনি কী হারাইতেছেন

'আর হিন্দু বাঙালীকে মারবে হিন্দিওয়ালারা। আমাদের নসিবে সিন্ধুবাদ আর ওদের বরাতে হিন্দুবাদ।'

আরব্য-উপন্যাস বলে ভ্রম হলেও, পাল্লার দুধারেই যে সমান ভার, সেটা আমি প্রমাণ করে দেখাতে যাই। একেবারে পর্বত-প্রমাণ!

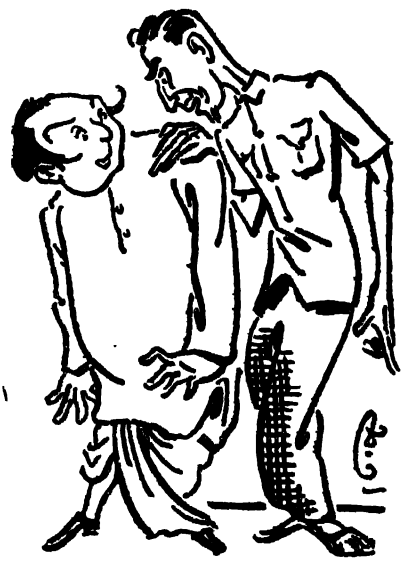

পাঠান-রাজত্বে অসন্তোষ!

চল্‌তে চল্‌তে আমাদের আলোচনা চলে। হঠাৎ তিনি আমার ঘাড়ে ঝুঁকে পড়ে বলেন—'সত্যি কথা বলি বেরাদর, এই পাঠান-রাজত্ব আমার ভালো লাগে না। এখন এরা হিন্দুদের ভাগাচ্ছে, তা ঠিক, কিন্তু হিন্দুরা গেলে তার পরে আমাদের ভোগাবে।'

'কী বলেন মশাই, রাজ্য ওদের হতে পারে—কিন্তু পাট? আমাদের পাট?..... বাধা দিয়ে আমি বল্‌তে যাই।—'পাট তো আমাদের? মারে কে?'

'ওদের রাজ্যপাট, আর আমাদের লোপাট। হিন্দু-মুসলিম কোনো বাঙালীকেই ওরা নেক্‌-নজরে ছাখে না। ওদের মতলব, আগে আমাদের দুই ভাইকে ফারাক্‌ করা, তারপরে—তারপরে ভালো করে ফাঁক করা।'

আপনি জানেন না !

'ছি ছি, হিন্দুকে আপনি ভাই বলছেন ?' আমি আঁৎকে উঠি : 'কাফেরদের ? তোবা তোবা।'

কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোনো প্রতিধ্বনি আসে না, খুব সম্ভব লজ্জাতেই, তিনি বোবা হয়ে থাকেন।

দেখতে দেখতে এসে পড়ি নিজের এলাকায়।

আমার বাসার বরাবর এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। খুঁৎ খুঁৎ করেন কিরকম। উঁকি মারেন এদিকে সেদিকে।

'কী ? কিছু হারিয়েছে নাকি আপনার ?' আমি জিগেস করি।

'তাই তো ভাবছি। মনে হচ্ছে কি যেন ফেলে এলাম কোথায় ! মালুম হচ্ছে না ঠিক।'

'ও, সেই ইঁটখানা ? তা সেটা তো—সে তো আপনার—সেই চাখানাতেই থেকে গেল।'

অকথিত অকথ্যতা।

'ও—তাই ! তাই বটে। তাই হাত খালি খালি ঠেকছিল কেমন !' স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো ভদ্রলোকের—'সেই জন্যেই এমন হাল্কা হাল্কা লাগছিল। তাই বটে।'

আপনি কী হারাইতেছেন

'দেখুন ভালো করে'—আব কিছু হারাননি তো কোথাও ?'

আমাব দরোজার সামনে এসে দাঁড়াই।

'না। আর—আর কী হারাবো ? আব তো কিছু সঙ্গে ছিল না আমার।' তবুও একবার তিনি পথের ওপবে চোখ বুলিয়ে নেন—'নাঃ, আবার কী হারাবো ?'

'কী হারিযেছেন বলবো ? বলবো আমি ?' বলতে বলতে দবজা খুলে ভেতরে ঢুকি। বলতে গিয়েও বলি না। দরজাটা বন্ধ কবে দিই ভালো করে'।

বলবো বন্ধু ? কী হাবিয়েছেন আপনি ? বেহেস্ত। আপনার বেহেস্তের সর্টকাট্। সেই আস্‌মানি পাকিস্থানে পাকাপাকি আস্তানা। একমাত্র কাফেরকে মারতে পাবলেই—সেই একমাত্রার পুণ্যবলেই যে-বেহেস্ত, আপনার স্বহস্তে আসতে পাবতো, বেহাত করেছেন আপনি তাকেই।

'আপনি কী হারিয়েছেন আপনি জানেন না।'

না-জবাই-হওয়া নিজেকেই আমি জবাব দিই।—'হায বেরাদর, হারিয়েছেন আপনি আমাকেই !'

হ্যাঁ, আমাকেই। নিজের দোষেই হারিয়েছো তুমি দোস্‌ত্ !

দুই

খুন্ করে নয়, ফাঁসি মকুব হয়ে না, অগ্নিযুগের দাদাগিরির দৌলতেও নয়—দ্বীপান্তর ছিলো আমার অদৃষ্টে। কোনো ফেরেব বাজি না করেও·····কপালের ফেরে আন্দামানে যেতে হোলো আমায়·····

এই তো সেদিন—দেশ স্বাধীন হবার অ্যাদ্দিন পরে···রবীন সেন বাত্যাতাড়িত হয়ে এলো ঢাকাব থেকে। এসে, না থেমেই, সেই তাড়নার মুখে কুটোর মতন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমার—ধারণাতীত তাড়ায়—আমার আন্দাজের বাইরে—একেবারে আন্দামানে।

সে বল্লে, না ভাই, সভ্যতার এই পাপ-সংস্পর্শে আর নয়। কলি-যুগের এই কলুষতা—বিংশ শতাব্দীর এই বিষ—এই রিরংসা, এই সংঘাত, এই সঙ্কটের থেকে এসো আমরা সুদূরপরাহত হয়ে যাই। রাজধানীর এত সব হানাহানির মধ্যে কেন আব? নাগরিক জীবনের ছোঁয়াচ থেকে এসো আমরা পালিয়ে যাই—চলে যাই—দূরে—অতি দূরে অন্য কোথাও। আর কোথাও।

'নাগরিক জীবনের কথা বলচো? কিন্তু এখানকার এই জীবনের মান—' বলতে যাই আমি।

'জীবনের মান? মান আছে, কিন্তু মর্যাদা কই? হাই স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর কথা তুলচো তুমি? কিন্তু এই মানদণ্ডেই তো এর প্রাণদণ্ড হয়েচে ভাই, টের পেয়েচো সেটা? জীবনের মান নয়, জীবনের মানে। তাই খুঁজতেই বেরুনো যাক্ এবার।'

রবীন সেন যেভাবে, আমার ভাষায় আমাকে পরাস্ত করলো তারপর আস্ত থাকা গেল না আর। কালাপাণি পার হতে হোলো তার সঙ্গে।

আপনি কী হারাইতেছেন

জীবনের মানে টের পেতে আন্দামানে এসে পৌঁছলাম।

পোর্টব্লেয়ারে পা দিয়েই থামলো না রবীন। সে বল্লে,—'আরে রাম! এতো দেখছি আরেক শহর। যুদ্ধের মরশুমে ইয়াঙ্কিদের দৌলতে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেচে। না ভাই, সভ্যভব্য হয়ে এখানে থাকা পোষাবে না আমাদের। নির্জন জায়গা দেখতে হবে একটা।'

আরামের শহরবাস ছেড়ে রামের বনবাস

'ছাখো, কবিগুরু বলেছেন বটে 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনো খানে'—কিন্তু তার মধ্যে কি বন্য কোনোখানের ইঙ্গিত ছিলো কিছু? তাছাড়া, তুমি ভুল করছো…' বলে' আমি ওর আত্মাকে বিদ্ধ করি—'তুমি রবিন্‌সন্ নও, রবীন সেন।' আত্মবিদ্ধির সাহায্য করি।

'রবিন্‌সন ছিল না কোনোদিন, ওটা গল্পকথা। তবে এইবার থাকবে। এই রবীন সেনই ক্রুশো হবে, তুমি দেখে নিও।' আমার কথায় ক্রুষ্ট হয়ে সে বল্লো।

আন্দামানের গা-লাগাও বিস্তর ছোটখাট দ্বীপ। ইতস্ততঃ ছড়ানো।

সেই দ্বীপপুঞ্জের পরিধি কোনোটার বিশ মাইল, কোনোটার বিয়াল্লিশ।* কিন্তু ওসার কম বলে' কি অসার বলে, কে জানে, এখনো সে সব অঞ্চলে জনপ্রাণীর আমদানি হয়-নি। সেই অচলিত সংগ্রহের একটাকে বেছে নিয়ে খুঁটি গাড়লাম আমরা। গলা বাড়ালাম আমার ক্রুশকাঠে—রবীন সে ... ক্রু শো ত্বে র পরাকাষ্ঠায়।

শুরু হোলো আমাদের নির্বাণদশা। সভ্যতার শূন্যলোকে অক্ষুণ্ণ শান্তির জীবন। জী ব দ্দ শা য় মোক্ষলাভ। জী ব নে র মোক্ষম্ চোট্।

রোজ সকালে উপলা-হত ঢেউয়ের কলস্বরে ঘুম ভাঙে আমাদের। সূর্যের মুখ দেখে বউনি হয়, তাই রোজকার রোজগার। শুষ্ক ঘাসের শয্যা ছেড়ে তুড়ি লাফ মেরে উঠি। খড় বাঁশ দিয়ে যে-ঘর আমরা বেঁধেছিলাম—তার মধ্যে খড় ছিলো, কিন্তু খড়খড়ি ছিল না। কিন্তু না থাক্ গে, বিছানায়

সূর্যই রোজকার রোজগার

বসে সমুদ্র দেখার বাধা ছিল না একটুও। কেননা, ঘরের মাথায় ছাউনি উঠলেও, কোনো দেয়াল খাড়া হয়নি তখনো।

বিছানা ছেড়ে সটান্ সমুদ্রে গিয়ে পড়তাম। সেই ছোট্ট দ্বীপের মুঠোয় সমুদ্র তার গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিজেকে গলিয়ে অতি ছোট্ট এক উপসাগর গড়েছিল। বৃহদাকার না হলেও, হ্রদাকার সেই সামুদ্রিক গলিতে সমুদ্রের সুবিধা ছিল, কিন্তু দাপট ছিল না একটুও। বঙ্গোপসাগরের বড় রাস্তায় পা বাড়াতে যারা নারাজ (যেমন আমি), মনে হয়, সেই সব ভয়ে-পেছপাদের জন্যেই বিধাতা বিরলে বসে জলপথেও যেসব গলিঘুঁজি বানিয়েছেন এটি তার একটি।

সমুদ্রস্নান সেরে আমরা কোদাল নিয়ে পড়ি তারপর। সেইটেই আমাদের সকালবেলার পড়া। নিজের ফসল নিজেই ফলাও—তার প্রথম পাঠ। একটুখানি জমি কুপিয়ে সুসার করে শাকসব্জি গাজর ভুট্টা-ফলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আরো জমিয়ে, জমিদের আরো কোপান্বিত করে তরিতরকারির উচ্চ স্তরে—কলামূলোর ফলাকাঙ্ক্ষায় এগুবার কল্পনা যে ছিলো না আমাদের তা নয়।

ভুট্টার চাষে দুজন খোট্টা আমাদের সাহায্য করতো। কিছুদিন আগে পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে রবীন তাদের নিয়ে এসেছিল। কালাপাণির আসামী—বকেয়া কয়েদী দুজনা। জেলের খাটুনি খতম্ হবার পরেও তারা থেকে গেছলো আন্দামানে, মুলুকে ফেরেনি। নাগরিক জীবনের আওতায়, সভ্যতার ছোঁয়াচে ফেরৎ যেতে রাজি হয়নি মনে হয়। আদর্শ সাকরেদ্ জ্ঞান করে তাদেরকে বেছে এনেছে রবীন। অনেক বাছবিচার করে এক দ্বীপান্তর থেকে আরেক দ্বীপান্তরে টেনে নিয়ে আসা ওদের।

আপনি জানেন না !

আজকাল জমি কোপানের তাল ওরাই সামলায়, আমরা তালগাছের তলায় বসে বিশ্রাম করি। মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ি, হুকুম্ ছাড়ি জোর গলার—ওতেই হয়। এ রকমের জীবনযাপন মন্দ না। শহরের অ-বিশ্রাম অশান্তির থেকে এখানকার অবিশ্রাম শান্তি, একেক সময়ে দুর্বিষহ বলে ঠেকলেও, ক্রমেই বেশ ভালো লাগে। নবদাম্পত্যের মতই, সবকিছুই গা-সওয়া হয়—হয়ে যায় এককালে।

তবে অসুবিধা আছেই। মাঝে মাঝেই দেখা দেয় নানারূপে—অভাবিতভাবেই। প্রকৃতিমাতার স্তন্যদানে কি লালনপালনে কার্পণ্য না থাকলেও প্রকৃত মতি বুঝে ওঠা দায়। এক এক সময় মনে হয়, মাতৃস্নেহ নয়, জামাতৃস্নেহ তো নয়ই, মাতা-প্রকৃতির যেন বিমাতার প্রকৃতি। সেই সময়ে সভ্যতার পুনর্মূষিক হয়ে শহুরে-শাশুড়ির জামাই আদরে ফিরে যাবার সাধে মনটা ছট্‌ফট্ করে।

করে বেশির ভাগ আমার।...একদিন আর আমি থাকতে পারি না। সকালের জলকেলির ফাঁকে বলে ফেলি ওকে—'দ্যাখো রবীন, আমাদের যেন একটু আদিখ্যেতা হচ্ছে। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি? এতটা না করলেও চলে। শহরে নাই বা গেলাম, নাই বা এলাম শহুরে, কিন্তু সেখান থেকে একালের জিনিসের এক আধটা এখানে আনলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয় না। তাতে সভ্যতার সংস্পর্শেও যেতে হয় না, নাগরিকতার লেশমাত্রও লাগে না গায়, সরল জীবন আর সমুচ্চ চিন্তার হানিও হয় না একটুও—অথচ বেঁচে থাকার আরাম বাড়ে।'

'যথা?' রবীন আমাদের সর্বদাই যথাযথ। সব সময়েই সে উদাহরণের মুখাপেক্ষী।

'অযথা বলছিনে।' বলে যথারীতি নিবেদন করি: 'মনে করো

আপনি কী হারাইতেছেন

গোটাকতক মুর্গি নিয়ে এলে পোর্টব্লেয়ার থেকে—যেখান থেকে ঐ বুদ্ধুদের এনেচো। মুর্গিরা কিছু সভ্যভব্য না। কিন্তু ডিম পাড়ে। ডিম কিছু সভ্যতার ডিণ্ডিম্ নয়। গভীর জঙ্গলেও পাড়া যায়—বন্য-কুক্কুটরা পাড়েন। মুর্গির সঙ্গে একটা প্রাইমাস্ স্টোভও আনলে না হয়। আর আনুষঙ্গিক কিছু মাখন-টাখন। সকালে নেয়ে উঠে অম্‌লেট খাওয়াটা এমন কী খারাপ? খালি খালি গাজর চিবিয়ে কী হয়?'

'গায়ের জোর বাড়ে।'

'আমার জ্বর আসে গায়। আমি বলি কি, দরকারী দু'একটা টুকি-টাকি জিনিস এখানে নিয়ে এলেও এ জায়গা রাতারাতি কিছু শহর হয়ে উঠবে না।'

'সুতানটির থেকে কি করে কলকাতার সূত্রপাত হয়েছিলো তুমি জানো?'

'জানি নে; ঐতিহাসিক নটিনেসের কতটুকুই বা জানি! তবে এ কথা আমি বলতে পারি যে আমরা দুজনে মিলে যত চেষ্টাই করি না কেন এই ক্ষুদ্র দ্বীপকে কিছুতেই কলকাতা বানিয়ে তুলতে পারবো না। আমাদের এ-জীবনে নয়, এক পুরুষে তো নয়ই। আমাদের দু' পুরুষেরো কম্মো না। হলফ্ করেই তা বলা যায়।'

'তা ঠিক। কিন্তু ক্রমেই তুমি তাও চাইবে। সেই দিকেই ঠেল্‌চো বলে মনে হয়। আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ছেদ আনবে শেষটায়।' বলে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

'তার মানে?'

'তার মানে—দু' পুরুষের কম্মো নয় বলচো তুমি—তুমি আর জানো না? তারপরেই তুমি আনাতে চাইবে কোনো এক নারীকে।'

আপনি জানেন না !

'আনাড়ির মতন বাজে বোকো না।'

'আর, একটা নারী হলেই সব হয়। ষোলোকলা পূর্ণ হয়—সর্বনাশের কিছুই আর বাকি থাকে না। সভ্যতা সমাজ সব তখন আসে আপনা থেকেই। শহর গড়ে ওঠে, সংঘাত জাগে। দুই পুরুষের মাঝখানে এক নারী—বাবা, তার চেয়ে সাংঘাতিক আর কিছুই হতে পারে না। সুন্দ-উপসুন্দর উপাখ্যান তোমার অজানা নয় নিশ্চয়?'

সে মহাভারত এনে ফ্যালে। আমি ভারতের দিকে ফিরি—'তেমন দুর্ঘটনা যদি বাধে, বেশ, আমি দেশেই ফিরে যাবো। একা নারী আর একমাত্র পুরুষই নাহয় থাকবে এখানে।'

'তাতেই কী বাঁচোয়া? তাই-তো ছিলো যে সবার গোড়ায়—ইডেন উদ্যানে—আদম আর হবা। তাই থেকেই—তারপর যা হবার সবই তো হোলো। সবাই হলাম। হোলো সবকিছু। আজকের এই কোটি কোটি মানুষ এলো কোথ্‌থেকে শুনি? সেই এক কটিতট থেকেই না?' মহাভারতেরো আগেকার আদিমপর্ব টেনে আনে রবীন—'সেই প্রথম আদম্‌সুমারির থেকেই তো আজকের এই মহামারি। ভারতের ত্রিশকোটি, চীনের ষাট—আর, তারপরে অধুনা এই কোরিয়ার লড়াই। কি করিয়া শুরু হোলো ভালো করে একবার ভেবে ছাখো ভাই।'

আমি আর ভাবতে পারি না, পাগল হয়ে যাই।

জেলেডিঙির মতন একটা আমরা পেয়েছিলাম। সেইটেয় করে মাঝে মাঝে রবীন পোর্টব্লেয়ারে যেতো—নূন মশলা ইত্যাদি আনাজ-পাতি আনার জন্যই। আর ফিরে আসতো কোনোবারে কোরিয়া, কখনো বা অ্যাটম্‌ বোমার খবর নিয়ে।

আপনি কী হারাইতেছেন

এবার গিয়ে কী মতি হোলো ওর কে জানে, অ্যাটম্ বোমায় পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনাতেই কি না, বিশ্বসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবদের বাঁচাবার মৎলবেই হয়ত—ফিরে এলো গোটাকত মুর্গি নিয়ে। আর, সেই সঙ্গে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড স্টোভও। আরো আশ্চর্য, সভ্যতার আরেক বাহনকে অযাচিত সাথী করে আনলো সে, ভারতীয় চা নিয়ে এলো—না চাইতেই।

ব্যস্, আর আমাদের পায় কে? যে-জীবন এমন ঢিমিয়ে পড়েছিলো ডিমিয়ে উঠলো মুর্গিদের সৌজন্যে। চান্‌কে উঠলো চায়ের সৌরভে। চাঙ্গা হয়ে উঠলো দেখতে না দেখতে। চাখতে না চাখতেই।

চায়ের কথা বলতে পারি নে, সোমরসের আধুনিক সংস্করণ কিনা পণ্ডিতেরাই জানেন, তবে বিচার করে দেখলে, ব্রহ্মডিম্বের পরেই বিধাতার সেরা আমদানি বলতে হয় এই মুর্গির ডিম। ব্রহ্মাণ্ড থেকে এ জিনিস বাদ দিলে দুনিয়ায় যা থাকে তা অশ্বডিম্ব। তাকে খালি উদরের শূন্য-পূরণই বলা যায় (জীবনের শূন্য-পুরাণও বলতে পারেন)! এই ডিম, আহা, অখণ্ডমণ্ডলাকারের খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তি—তাঁর অণুরূপান্তর। গোলোক-চ্যুত এই গোলক, পরাৎপরের পরমাত্মীয়তা—পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা। জিভে দয়ার চরম পরখ এই ডিম।

তারপর দিনকতক কাটলো বেশ আরামেই। মুর্গির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে উঠেই ডিম ভাঙি। অমল প্রভাতের সাথে সাথে অম্‌লেটের দেখা মেলে হাতে হাতেই।

জীবনকে সহনীয় বলেই মনে হয়। এমন কি, এই দ্বীপান্তর-বাসও এক এক সময়ে উপাদেয় ঠ্যাকে। রমণী ছাড়াও রমণীয় ভ্রম হয়।

আপনি জানেন না !

ইতিমধ্যে একদিন, ঘুম ভাঙতেই, আমি মুর্গিদের চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। রবীনকে ডেকে দেখালাম, আমার ঘাসের বিছানার পাশে এক বিছা। আমার পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটিয়েছেন বাছাধন !

'কাঁকড়া বিছে।' রবীন বললে।

'কাঁকড়াই হোক্ আর কাঁকড়ই হোক্—এ কিছু সরকারী রেশন্ নয় যে ঘাড় পেতে নিতে হবে। বরদাস্ত করতে হবে মুখ বুজে। নাঃ, আজকেই আমি শহরে যাবো, নিজেই যাবো ডিঙি চালিয়ে বুদ্ধদের নিয়ে, নিয়ে আসবো চৌকি চেয়ার টেবিল। লেপ আর তোষক।'

'আনবে আনো, কিন্তু মনে রেখো এইভাবেই সভ্যতার নাগপাশে জড়াচ্ছো। বদ্ধ হচ্ছো অন্ধকূপে—সেঁকোবিষ ঢোকাচ্ছো তোমার শরীরে। নাগরিকতার আবজনা এনে জমাচ্ছো এখানে।'

'জমছে জমুক। সে-জমাখরচের হিসেব আমার। সভ্যতার যমালয় আমার জন্যে, তোমার জন্যে নয়। চৌকিতে শোবো আমি মাটিতে শুয়ে পোকামাকড়ের চৌকিদারি করা আমার কম্মো না। তুমি না হয় জমিদার হয়ে ঘাসের বিছানায় শুয়ে থেকো, তোমার বিছাদের নিয়ে মনের সুখে—আরামে।'

'চৌকিতে শোবে? শোবে তুমি, আমাকে মাটিতে ফেলে রেখে? পারবে তো?'

'আলবৎ। চৌকিতে তো শোবোই, লেপও গায়ে দোবো তার ওপর। তোমাকে আর ওসব আবর্জনায় জড়াবো না। সভ্যতার প্রলেপ একাই আমি সইবো কষ্ট করে।'

'বেশ।' বলে' ও গুম্ হয়ে থাকে। আমি বুধ আর বেহপ্পৎদের নিয়ে ডিঙি মেরে বেরিয়ে পড়ি।

আপনি কী হারাইতেছেন

(বুধ আর বৈহপ্‌পং—চাকর দুটোর এই নতুন নামকরণ করেছিল ও-ই। রবিন্‌সনের ছিলো ফ্রাইডে আর আমাদের রবীন সেনের এই বুদ্ধু আর বৃহস্পতি।)

শহরে গিয়ে বিছানাপত্র তো নিলামই, সব আগে কিনলাম একটা আলো। এখানে এসে সন্ধ্যার পরে পড়াশোনার পাট বন্ধ হয়েছিল। সূর্য্যি ডুবলেই অন্ধকার, আর সন্ধ্যে হলেই শুতে যাওয়া। বাতি নেই, সারা রাতই শুয়ে থাকো, নভেলপড়া নাস্তি। সে যে কী শাস্তি। বাধ্যতা-মূলক শোয়া—তার মতন অসোয়াস্তি আর হয় না।

আলো ছাড়াও আরেকটা জিনিস কেনা গেল। রবীনকে না জানিয়েই কিনলাম। আধুনিক মেকারের অল্‌ওয়েভ্‌ এক রেডিও সেট্‌—সেই সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক্‌বেল্‌ একটা।

রেডিও চালাবার জন্যে ডাইনামো কেনা হোলো—তার সাথে পেট্রল ইঞ্জিন্‌—ইস্‌পাতের ফ্রেমে বসানো—পাওয়া গেল একেবারে রেডি। গত যুদ্ধের বাড়তি আমেরিকানদের ফেলে-যাওয়া কতো জিনিস যে পড়েছিল। কিছুরই অভাব ছিল না পোর্টব্লেয়ারে। লৌহঘটিত খাটও নিলাম দুখান—দু' সেট্‌ বিছানাও। জানি রবীনের লোভ নেই, তবু তারো যেন কোনো ক্ষোভ না থাকে। সব নিয়ে আমাদের ছোট্ট ডিঙিতে কুলোলো না, বলাই বাহুল্য! মালবাহী বড়ো একটা নৌকা ভাড়া করে আনতে হোলো আবার।

বাসায় আসতেই রেডিয়ো সেট্‌টা নজরে পড়লো রবীনের, দেখে যেন ক্ষেপে গেল সে। সমস্তই সে টান্‌ মেরে সমুদ্রগর্ভে ফেলে দেয় আর কি! অনেক কষ্টে সভ্যতাকে জলাঞ্জলির হাত থেকে বাঁচালাম।

'এই যে তুমি শহরের আবহাওয়া টেনে নিয়ে এলে এখানে, দেখো এর ফল কী হয়। বেশ জানি, তুমি এখানেই থামবে না—' মুখ গম্ভীর

করে' ও জানায়—'একদিন তুমি সিনেমাও আনবে। নিয়ে এসে খাড়া করবে এই খোড়ো ঘরের পাশটায়। কী সর্বনাশটাই যে হবে!'

'মাভৈঃ! কথা দিচ্ছি তোমায়—অদ্দূর আমি এগুবো না।' অভয় দিয়ে ওকে আমি উৎফুল্ল করতে চাই: 'এই বিজন বিভুঁয়ে আমাদের চিত্তবিনোদনের খাতিরে যেটুকু দরকার তার জন্য এই রেডিয়োই যথেষ্ট। আর, এর দ্বারা, তুমি ভেবে ছাখো, সভ্যতা আমাদের মোটেই চালিত করছে না, বরং উল্‌টে আমরাই তাকে চালাচ্ছি। সভ্যতার ক্রীড়নক না হয়ে সভ্যতার সঙ্গে ক্রীড়া আমাদের। সভ্যতা আমাদের কাহিল করতে পারছে না একটুও, উল্‌টে সে-ই এখানে কাবু। রেডিয়ো কমানো-বাড়ানো, খোলা, বন্ধ করা—আমাদের ইচ্ছে। ওর চাবি আমার হাতে।'

রবীন কিছু বলে না, খালি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

আমি ডাইনামো বসাই। পেট্রল-ইঞ্জিনটাকে এনে পাড়ি খোড়ো-ঘরের পেছনটায়। উঁচু করে এরিয়াল্ খাটানো হয়। ইলেক্‌ট্রিক্ জেনারেটর খাড়া হলে বিদ্যুতের তার টানা হয়—টেনে নিয়ে যাই শোবার ঘরে। ল্যাম্পের সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তারপরে আরেকটা তার্‌কে তারিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সমুদ্রের ধার বরাবর—যেখানে আমরা জলকেলি করি সকালে। আমাদের ঘরের পাশে উঁচু টিলার ওপরে থাকে তারের একধার, তার সাথে সুইচ্; আর অন্যধারে, সমুদ্রের ধারেই, লাগানো হয় ইলেক্‌ট্রিক বেল্‌টা।

'এই বেল্ এখানে কেন?' স্নানযাত্রায় এসে রবীন জিগেস করলো আমায়।

'আমরা এখানে চান্ করি তো?' আমি জবাব দিলাম।

'এর পর কি তাহলে আমরা ঘণ্টা ধরে চান্ করবো? না কি, ঘণ্টা বাজিয়ে?'

'না, তা নয়।' নিজের পুরা কীর্তি প্রকাশ করতে হয়: 'আমার ধারণা এই সমুদ্রে হাঙ্গর আছে। সব সমুদ্রেই থাকে। বঙ্গোপসাগরও তার ব্যতিক্রম হবে না নিশ্চয়। সেই হাঙ্গরদের এক আধটা hungry হওয়াও বিচিত্র নয়। যদি তার একটা ছট্‌কে এই সামুদ্রিক গলিতে এসে সেঁধোয় কখনো? গলির মুখ খুব সঙ্কীর্ণ হলেও হাঙ্গরের গলবার পক্ষে— গলা বাড়াবার পক্ষে— যথেষ্টই। আমরা যখন চান্ করি তখন দেখেছি বুদ্ধুরা ঐ টিলার উপর বসে থাকে। বসে বসে ছাখে আমাদের লম্ফ ঝম্প। ওখান থেকে এই জলপথের মুখ অব্দি দিব্যি দেখা যায়। জলও তো এখানকার বেশ পরিষ্কার। যদি হঠাৎ কোনো হাঙ্গর ঢুকে পড়ে

সামুদ্রিক লম্ফ-ঝম্ফ

ভুল করে'—চোখে ওদের পড়বেই। আর তক্ষুনি ওরা সুইচ্ টিপে ঘণ্টা বাজিয়ে সাবধান করবে আমাদের। ঘণ্টাধ্বনিতে সারা সৈকত জুড়ে সাড়া পড়ে যাবে। তাতে হাঙ্গর ব্যাটা ভয় খেয়ে নাও যদি পালায়, যথাসময়ে খবর পেলে আমরা তো পালিয়ে আসতে পারবো—প্রাণ বাঁচাতে পারবো আমাদের।' নিজের কীর্তিকাহিনীতে নিজেই ফুলে ডগমগ হই।

এতক্ষণে রবীনের মুখে একটু হাসি দেখা দেয়—'হ্যাঁ, একটা বুদ্ধির কাজ করেছো বটে। এখন, বুদ্ধু বা পারলে হয়।'

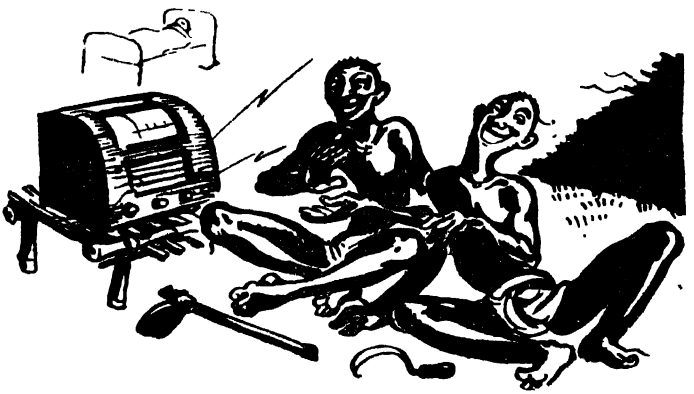

বেতরিবৎ !

বুদ্ধুরা পারে। ঘণ্টা বাজাতে তাদের কসুর হয় না। ভারী আমোদ পায় বাজিয়ে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজায়—যখন তখন—যখন কোথাও কোনো বিপদের চিহ্নমাত্রও নেই তখনো। আর যখন বাজায় না, তখন কান খাড়া করে রেডিয়ো-ব্যঞ্জনা শোনে। নিখিল ভারত বেতারের গান, বাজনা, নাটুকে পালা, খবর বলা—সব কিছুতেই তাদের কান। হিন্দি অনুষ্ঠান হলে তো কথাই নেই, বাঙলাও বাদ দেয় না।

আপনি কী হারাইতেছেন

খাসা কাটে দিন। নগরজীবনের নাগরদোলার বাইরে, নাগরিকতার গরল লেশমাত্র টেস্ট্ না করেও কাটে বেশ। সভ্যতার সঙ্গে আড়াআড়ি করেও কোনো অসুবিধা নেই। অভাব নেই কোনো। দিব্যি কাটাই।

কিন্তু প্রকৃতির প্রতিহিংসা বলে তো একটা আছেই। সভ্যতাও প্রকৃতির মধ্যে—সভ্য প্রকৃতির মধ্যেই। সভ্যতাও একদিন হিংস্ররূপ ধারণ করে আক্রমণ করলো—করলো আমাকেই আবার—অতর্কিতভাবে—অসভ্যের মতন।

একদিন বিকেলে গরম বোধ করে সমুদ্রের জলে নেমেছি। সাঁতার কাটছি এন্‌তার, মনের ফূর্তিতেই, এমন সময়ে অনতিদূরে হাঙ্গরের মতন কী যেন দেখা দিলো। হাঙ্গরই তো। তীর্যক নেত্রে তাকালাম। আরো দেখলাম, তীরবৎ বেগে সেটা এগিয়ে আসছে—আমার দিকেই।

তারপর আর তাকালাম না। পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে ছুটলাম তীরের দিকে। পঞ্চাশ গজ সাঁতার-বাজির রেকর্ড রেখে কিনারায় উঠে হাঁপাচ্ছি যখন, দেখতে পেলাম রবীনকে। হাসতে হাসতে সে আসছে।

রবীন আমাকে হাঙ্গরের সঙ্গে পাল্লা দিতে দেখেছিলো। তাকে বেশ খুশি দেখা গেল।

'সভ্যতার ক্রীড়নক না হয়ে সভ্যতার সঙ্গে ক্রীড়া করা এতদিনে সার্থক হোলো আমাদের।' সহাস্য মুখে সে বল্‌লো।—'আরেকটু হলেই সব লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে যেত। পুরোপুরি হোলো না যে, এই দুঃখু।'

'মানে? তার মানে?' আমি চটে উঠি—'ইলেক্‌ট্রিক্ জেনারেটরটা কি অচল হয়ে পড়েছে? বেলের আওয়াজ পেলাম না কেন শুনি?'

'বেল পাকলে কাকের কী? থাকলেই কি, না থাকলেই বা কী।

ডাইনামো চল্‌ছে ঠিকই, তবে ডাইনরা কেউ নেই। চম্পট দিয়েছে একটু আগে। কার বেল্‌ কে বাজায় !'

'তবে বেল্‌ বাজলো না কেন ? হতভাগাগুলো গেল কোথায় ?' আমি আরো স্বর-গরম হই : 'বুদ্ধু চাকরগুলো গেল কোথায় আমাদের ?'

'আর কিছু নয় ভাই, এই সভ্যতার সঙ্কট। ছুটি নিয়েছে তারা।'

'ছুটি নিয়েছে ! কে দিলো ছুটি ? তুমি ?'

'আজ্ঞে না। গতকাল বেতারের হিন্দি ভাষণে তারা জেনেছিল বিহারী সরকারের আইন জারি। বাড়ির চাকর-বাকরের জন্যে তাদের গভর্ণ-মেণ্ট যে বিল্‌ পাশ করেছেন তার খবর পেয়েছে তারা।

আইনের বেপরোয়া

মাস মাস মোটা মাইনে, রোজ আট ঘণ্টার মোট খাটুনি, আর শনিবারের আধ-বেলা কামাই। আজ শনিবার না ? তারা নিজের থেকেই ছুটি নিয়েছে আজ বিকেলে। আমাকে না জানিয়ে—আমাদের পরোয়া না করেই !···সরকারী পরোয়ানা যে !'

তিন

অনিমেষ আমায় নিয়ে চা-খানায় ঢুকলো। সবে সে সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে ফিরেছে, সঙ্গ দিচ্ছে সবাইকে। সবার কাছেই পাড়ছে তার শিকার-কাহিনী। আমাকেও না শুনিয়ে ছাড়বে না।

তা ভালোই তো, বাঘ-ভালুক আর মন্দ কি? চা-অমলেটের সঙ্গে হলে কারো বাজাউজীর মারাতেও নারাজ হতে নেই। ওর শিকারোক্তি আমি অস্বীকার করতে পারিনে।

পাখিস্থানের খবর

রেস্তরাঁর নিরালা ধারটা বেছে নিয়ে বসতে যাচ্ছি, কে যেন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো ছাঁছাছোলায়,— 'আসুন মশাই! বসুন! কী চাই?'

চমকে ফিরে তাকালাম। খাঁচার মধ্যে এক কাকাতুয়া, তীর্যক নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে। তিনিই চ্যাচাচ্ছেন। তাঁরই বাক্য-তীরবিদ্ধ আমরা।

রেস্তরাঁওয়ালা এগিয়ে এসে আশ্বস্ত করলো—'ঘাবড়াবেন না মশাই!

ডজনখানেক বুলি ওর মুখস্ত। তবে অচেনা নতুন কোনো মুখ দেখলে এইটেই বেশি আওড়ায়।'

আমরা ঘাবড়াইনে। আমি তো নয়ই। চা-খানায় এসে খানা চা না ঠেসে (পরের পয়সায় খাবার !) ঘাবড়াবার ছেলে বাঙলা দেশে আছে নাকি আবার ?

রেস্তরাঁওয়ালাকে চা-ইত্যাদির হুকুম দিয়ে অনিমেষ পাখীটার দিকে তাকালো। তারপরে তার অনিমেষ-দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো আমার ওপর—

'কাকাতুয়ার কথা যদি বলো, তাহলে টুনটুনির মত আর হয় না।' বললো সে : 'তোমাকে আমার টুনটুনির কথা বলেছি ?'

ওর কথায় আমার ধাক্কা লাগে। পক্ষীতত্ত্বে আমি বিমলাচরণ লাহার ন্যায় বিশারদ নই, তা জানি, কেবল পাখা দেখে কি গাছের শাখায় দেখে পাখী চেনা আমার পক্ষে শক্তই। চড়ুই, পায়রা, দাঁড়কাক আর ঐরূপ গোটাকয়েক ছাড়া (পক্ষীজাতের মধ্যে যারা নিতান্তই উড়ে !) অপর কাউকে সনাক্ত করতে পারব কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহলেও পাখীদের পক্ষপাতী না হয়েও আর এ বিষয়ে ইলাহী জ্ঞান না থেকেও কাকাতুয়া আর টুনটুনি যে এক জাতের নয়, এ আমি বেশ ধরতে পারি। শুনেই আমার কেমন খট্‌কা লাগে। ময়নার থেকে টিয়াকে আমি পৃথক্ করতে পারব না, তা ঠিক, কিন্তু টুনটুনি যে কাকাতুয়া নয়, এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি। ময়না-তদন্ত না করেই বলা যায়।

টেকনিক্যাল ভাষায় আমার সংশয় ব্যক্ত হয়—'দ্যাখো অনিমেষ, লাহা আর দুলাহায় যে তফাৎ, যতোটা পার্থক্য জামাই আর জামায়, তোমায় আর আমায়, আমার ধারণা একটা সাধারণ কাকাতুয়া আর টুনটুনিতে—'

সে বাধা দিয়ে বলে, 'আহাহা! টুনটুনি আর কাকাতুয়া এক, কে তোমায় বলেছে? আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি আমার টুনটুনি। আমার কাকাতুয়াটার নাম রেখেছিলাম টুনটুনি। লোকে কি আদর করে ছেলেকে বাঁদর বলে ডাকে না? বাদর হয়ে যায় নাকি তাই বলেই?'

হ্যাঁ, একটা কথা বটে ভেবে দেখলে, পাখী, বাঁদর আর পাড়ার ছেলে তিনই গাছের শাখায় সমান্তরাল। সমান শোভমান। আর সমভাবে সুদূর থেকে আদরণীয়।

'বলেছি তোমায় আমার টুনটুনির কথা? কথাবার্তায় অবিকল মানুষের মতন। আহা, পাখীটা অনেকদিন ছিলো আমার কাছে, বলিনি তোমায়?'

অনিমেষের বাঁদরামি

'না। তোমার বাঁদরের কথা আমায় বলেছো, শয়তান, না কী যেন তার নাম। তবে সে তোমার আদুরে ছেলে কিনা, তা আমি বলতে পারব না—'

'ওঃ, সেই শয়তান ? সেই বাঁদরটা ?'

'হ্যাঁ, যে তোমার ঘাড়ে বসে পিঠ চুলকাতো—তোমার কি তার নিজের পিঠ তা তুমিই জানো। আর তোমার সেই মোহনপ্রসাদ—রাজহস্তী ! যে শুঁড় দিয়ে জল তুলে ফোয়ারার মতো ঢালতো তোমার মাথায়—চান্ করবার সময়। তুমি চান করতে নামলেই সেও পুকুরে নামতো শুড় শুড় করে এবং ভাইসিভার্সা। কিন্তু তোমার টুনটুনি নামক কাকাতুয়ার কোনো কথা ঘুণাক্ষরেও তুমি আমায় বলো নি।'

'ঘুণাক্ষরেও না ? তাহলে বলছি শোনো। এক্ষুনি শুনবে, চা দিয়ে থাক্ আগে।'

চায়ে গলা ভিজিয়ে সুরু করলো অনিমেষ—'ভারী ইলম্‌দার ছিল হে পাখীটা ! মুখস্ত বুলি আওড়ানো নয়, রীতিমত মুখে মুখে জবাব দিত কথার। ভারী বোল্‌চাল্ ছিলো হে ! ঠিক মানুষের মতোই কথা কইতো। হুবহু। আর যেমন চৌকস্ তেমনি কি চোখা ? সেই জন্যেই, ওর টন্‌টনে জ্ঞানের জন্যেই তো আদর করে নাম রেখেছিলাম টুনটুনি। সবসময়ে সে বসে থাকতো আমার কাঁধে। যখন যেখানে যেতাম, একদণ্ডের জন্যও কাঁধছাড়া হোতো না।.....'

'ওকে এমন করে কাঁধাতে তোমার কষ্ট হোত না ?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আর, কী কাজ দিতো যে পাখীটা ! কাঁধে বসে বসে দৃষ্টি রাখতো চারদিকে, চারধারেই চোখ ঘুরতো তার, লক্ষ্য ছিল সকলের ওপর। বিশেষ করে মেয়েদের দিকে নজর দিতো বেশ। রূপসী মেয়েদের দিকেই যেন ঝোঁকটা ছিলো বেশি। কোনো সোমত্ত মেয়ে পাশ দিয়ে গেলে অমনি সে চেঁচিয়ে উঠতো—ওব্‌বাবা.....'

আপনি কী হারাইতেছেন

'ওব্‌বাবা!' আমিও চেঁচাই: 'পাখীর মধ্যে তোমার show-মত্ততাই যে হে! তোমার অদূরদৃষ্টি পেয়েছিলো পাখীটা মনে হচ্ছে।' দার্শনিকের মতন বলি।

'ওর এই নেক্‌নজরের জন্যে একেক সময়ে যা মুস্কিলে পডতাম। এমন অপ্রস্তুত হতে হোতো, কী বলবো! ফেব কখনো কখনো সেই মুস্কিলেব থেকে, আপনাআপনি আসান্ হয়ে, ভাব জমে যেত আবার! ঐ পাখীব সূত্র ধরেই অচেনা মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমতো এমন! আহা, সেই সব মেয়েদের গাযে-পডা ভাব····· সেই সব ভাবেব কথা ভাবলে···'

কাকস্য পরি-বেদনা।

অনিমেষকে বেশ ভাবালু দেখা যায। গভীর দৃষ্টি যাকে বলে সেইরকম ওর দুই চোখে দেখা দেয়। ঠিক গাভীর চোখে যেমনটি দেখা যায। এই ফাঁকে আমি ওর প্লেটের অম্‌লেটটা সরিয়ে নিজের পেটে পাচার করে দিই—'বলে যাও। থামলে কেন?'

'অ্যাঁ?'

আপনি জানেন না!

'টুনটুনি।'

'ও হ্যাঁ, টুনটুনি……' চমক্ ভাঙ্গে ওর। মুহ্যমান অনিমেষ মনের উহ্যস্থান থেকে গুহ্য কথাগুলি পাড়তে থাকে আবার—'এইভাবে কতো মেয়ের সঙ্গে যে যোগাযোগ ঘটিয়েছিল সে, তা বলবার নয়! শিকারে বেরুতাম তো, রাজপুতানায়, কি আসামের জঙ্গলে, কি বেহারের দেহাতে—সেও যেত আমার সাথে। কাঁধে কাঁধেই থাকতো আমার। মাঝে মাঝেই উড়ে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখে আসতো সারা তল্লাট—দশ বিশ মাইল চক্কর মেরে আসতো এক এক পাল্লায়—'

'পাখীদের মধ্যেও চক্করবর্তি আছে তাহলে?' জেনে আমি খুসি হই।

'ঘুরে এসে খবর দিতো আমায়…'

'বাঘ-ভালুকের বার্তা বুঝি?'

'মেয়েদের খবরই বেশির ভাগ। কোথায় কাকে দেখে এলো, কে কেমন দেখতে, এই সব। জংলা জায়গায় দূরে দূরেই তো বাড়ি ঘর—গায়ে গাঁয়ে দশবিশ মাইলের ফারাক্—গায়ে গায়ে লাগাও না আদপেই। কাজেই, বুঝতেই পারছো, ওর খবরে সুরাহা হোতো খুব। শিকার-পর্ব সেরে টেরে মনের মত জায়গায় খুঁটি গাড়তে পারতাম।'

'সে আবার আরেক শিকার?'

'হ্যাঁ। আরেক পার্বণ।' অনিমেষ অস্বীকার করে না। আবার সে খানিকক্ষণ অতীতের দিকে নির্নিমেষ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপরে স্মৃতিভারমোচন করতে সুরু করে—'অবশ্যি, পথঘাটের হদিশ্ও যে না দিত তা নয়। কোথায় জলা, কোন্ ধারে জঙ্গল, কোন্খানে নদী—এসব খবরও বাৎলাতো। সাম্নে চড়াই থাকলে তাও এসে বলতো আমায়…'

আপনি কী হারাইতেছেন

'চড়াই? চড়াইয়ের কথা কেন?' আমি কৌতূহলী হই: 'তুমি কি অতো ছোটখাট পাখীও মারতে নাকি?'

'আহা-হা, সে-চড়াই কেন হে? চড়াই-উৎরাই কাকে বলে তাও জানো না? পাহাড়ী দেশের রাস্তার উঁচু-নীচুকেই বলে থাকে। একটা কাকাতুয়াও যে জানে বাপু?' সে বিরক্তি প্রকাশ করে।

'ও, সেই চড়াই? পাহাড়ে পথঘাটের চপেটাঘাত? জানি বই কি।' জানাই আমি: 'সে-চড়াই তোমার জলপথেও আছে। পদ্মা-গর্ভেও দেখা যায়।'

'তারপর শোনো, এবারের কথা বলি। গেছি সুন্দরবনে। বাঘটাগ হাতাবার মতলবেই। আমার এই শেষবারের শিকারের কথাই বলছি। এবার শিকারে গিয়ে আমার সেই টুনটুনিকে হারাতে হয়েছে ভাই সে ছল ছল কণ্ঠে বলে।—'চিরকালের মতই।'

'মারা গেল বুঝি পাখীটা?'

'না, মারা যায় নি। তবে সে মারা যাবার মতই। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের। চিরবিচ্ছেদ যাকে বলে—দুঃখের কথা আর বোলো না। যা কষ্ট পেলাম এবার শিকারে গিয়ে—! কিন্তু সে কষ্ট কিছুই না। সবচেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছি আমার টুনটুনিকে হারিয়ে!'

বেদনায় ও টন্‌টন্ করে। আমি সান্ত্বনার ভাষা পাই না। পাখীহারানী বিচ্ছেদের সান্ত্বনা কী আছে?

'গেছি সুন্দরবনে। নৌকাতেই আছি। জঙ্গলে জঙ্গলেই কাটছে দশ-বারোদিন। টুনটুনিও আছে আমার সঙ্গে। এধারে ওধারে উড়ে গিয়ে ঘুরেও আসছে মাঝে মাঝে, কিন্তু কোনো ধার থেকে কোনো খবরই আনতে পারছে না। .....'

আপনি জানেন না !

'বাঘের খবর ?'

'না বাঘের, না বাঘিনীর। না বাগাবার মতো আর কিছুর। মনে হচ্ছিলো যেন এক যুগ ধরে মেয়েছেলের মুখ দেখি নি। এমন বিশ্রী লাগছিলো ! তুমি কী বলবে জানি না, একেক সময়ে আমার কী মনে হয় জানো ? মনে হয় যে, বাঘ-ভাল্লুক না হলেও চলতে পারে —চলে যায় আমাদের কোনোরকমে—সংসারযাত্রার বিশেষ কোনই অসুবিধা হয় না—কিছুই যায় আসে না জীবনের, কিন্তু ভাই, নারী ছাড়া এ দুনিয়া অচল। এ বিষয়ে তুমি কী বলো ?'

'নারি ছাড়া যে কী জিনিস, সে আর বলতে হয় না।' আমি বাংলাই—'তখন মকরধ্বজ লাগে।'

'যাক্ গে ! লাগুক্ গে !' বলে ষড়গুণবলিজারিত আমার জীবন-দর্শন সে উড়িয়ে দেয়—তার কাকাতুয়ার মতই। —'রোজই নৌকো থেকে নেমে শিকারে বেরুই। জঙ্গল ভাঙি। টুনটুনি থাকে আমার কাঁধে। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন কোত্থেকে উড়ে এসে খবর দিল টুনটুনি—'উঃ, কী মেয়ে গো বাবু ? কী বলবো, এমন চেহারা আর হয় না।' শুনেই আমি চম্‌কে উঠলাম। সুন্দরবনের কোনো কোণে সুন্দরীর দেখা পাবো, সে ভরসা যখন ছেড়েই দিয়েছি, সেই সময়ে টুনটুনির খবরে টন্‌কো হয়ে উঠতে হোলো। একটু অবাকও হলাম, বলতে কি ! য়্যাদ্দিন খালি সে কুমীরের পাত্তাই আমায় দিয়েছে, কোনো কুমারীর বিষয়ে টুঁ-শব্দও করে নি। বাঁদর আর খ্যাকশেয়ালের সম্বন্ধেই হুঁসিয়ার করেছে আমাকে। আদর করবার মতো সম্বন্ধস্থল তার চোখে পড়ে নি কোথাও। তবে য়্যাদ্দিনে কি তার হুঁস হোলো এবার ? বনে-জঙ্গলে থেকে জংলী বনেও ফের কি তার রূপ-গুণের দিকে নজর গেল আবার ?

টুনটুনির কথায় ওর নিশানা ধরে তক্ষুনি আমি রওনা দিলাম। টুনটুনিও ছুটলো আমার সঙ্গে। তাকে যা উৎসাহিত দেখলাম। এই ও উড়ে যায়, এই ঘুরে আসে, ঘুরে এসে একটু বসেই আবার উড়ে যায়। এমন উড়তি আর ফূর্তি তার আমি কখনো দেখি নি।'

'পক্ষি-চরিত্র ভাই, দেবতাদের ও অজানা।' আমি জানাই—'প্রায় নারী-চরিত্রের মতই দুর্জ্ঞেয়।'

'যা বলেছো। টুনটুনি বার বার যায়, বারে বারে ফিরে আসে। আর এসে বলে—'আহা, কী মিষ্টি মেয়ে বাবু? কী সুন্দর? মরি মরি! এমন পরির মত মেয়ে আর হয় না। এমন মেয়ে কখনো দেখি নি বাবু?' তার কথায়, না দেখেই, আমি যেন ক্ষেপে গেলাম। ছুটলাম জঙ্গল ভেদ করে। পড়ি কি মরি করে ছুট্ লাগালাম—সেই পরির উদ্দেশে।'

সুন্দরবনে সুন্দরীর খোঁজ।

'দেখা পেলে?'

'সেই কথাতেই তো আসছি হে। টুনটুনি এসে খবর দিলো আবার—'ওমা, কী চুমু খায় গো মেয়েটা। আর কী আদর গো তার।

আমার যেন উড়তে ইচ্ছে করছে।' শুনে তো বলবো কি ভাই, আমারো উড়তে ইচ্ছে করলো। সাধ হলো এক্ষুনি উড়ে যাই সেই মেয়েটার কাছে। চুমুর কথায় আমার মনটা অমন চন্‌মন্‌ করে উঠলো কেন জানো? চুমু যে খায়, সে আবার খাওয়ায়ও। সন্দেশের মতন মধুর হলেও, চুমুতে আর সন্দেশে তফাৎ আছে। ও-জিনিস একলা খাবার না। একা একা খাওয়া যায় না, অপরকে খাইয়ে খেতে হয়। সত্যি বলতে, ওর খাওয়া আর খাওয়ানো এক কথা। কাজেই টুনটুনির কাছে সেই খাইয়ে মেয়েটির কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে আমি—'

'চুমুৎকৃত হতে ছুট্ লাগালে? বলো কি হে?'

'নয় কেন?' সে ফোঁস করে' ওঠে: 'মানুষের আনন্দ কিসে শুনি? আননদানেই আনন্দ। আনন দিয়ে-নিয়েই। যাতে আনন দেয় আর দিতে গিয়ে আরেকটা আনয়ন করে—তাইতেই···(আন্‌কোরা এক অধর-মুদ্রা আম্‌দানি করে অনিমেষ) আর, এই আদানপ্রদান কিসে হয়? চুমু দিতে গিয়েই না?'

অনিমেষের দৃষ্টিভঙ্গী

ভাষা-তত্ত্ব গুলিয়ে এক করে সে একাকার করে। অনিমেষ-দৃষ্টি, আর দৃষ্টিভঙ্গী, আর ওর দর্শন যুগপৎ আমাকে খোঁচায়। ওর ব্যা-করণে আমি টুঁ শব্দ করতে পারি না।

আপনি কী হাবাইতেছেন

'শুধু এইখেনেই আমরা সবাই পরমুখাপেক্ষী। এই চুমুর বেলায়। কেবল এই KISS-এব তোযাক্কায়,—নইলে কার কিসের তোয়াক্কা?'

'কিন্তু ভাই, লিপ্সা জিনিসটা কি ভালো?' আমি বলি—'পরনারী LIPS-ই তো আরো ভাবী খাবাপ।'

'একাদিক্রমে, দিনেব পর বাত, সঙ্গহীন যার জঙ্গলে কাটে, তার কি সে-খেয়াল থাকে? কাণ্ডজ্ঞান থাকে তাব কোনো? তুমি আর কী বলবে, তারপরে আমি নিজেই তা টের পেযেছি। কতো ধিক্কার দিযেছি যে আপনাকে। এখনো দিচ্ছি।—ছি ছি ছি! এমন ভুলপথে কি মানুষ যায় কখনো, উজ্‌বুক একটা পাখীব কথায়? এমন আহাম্মুকিও করে কেউ! কিন্তু যা হবাব হযে গেছে। যাক্, যেকথা বলছিলাম। ছুটেছি হন্যে হযে—শরবন সবিযে, বাটা ঝোপের পাশ কেটে, জলা সাঁৎরে, লতাগুল্মের ভেতর না লট্‌কে, বনবাদাড পাব হযে ছুটেছি—উধাও। মাইল দশেক পেরিয়ে গেছি দেখতে না দেখতে—'

'আহা, শেষে তো দেখলে।' আমি বল্লাম. 'তখন তো দাম উসুল হোলো তোমার এই উদ্দামতাব।'

'হ্যাঁ, দেখলাম বই কি। তখনি তো দেখলাম। দিনভোব ছুটে সন্ধ্যের মুখে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে মেয়েটিব কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। টুনটুনিই দেখিয়ে দিলো মেয়েটিকে—'

'কি রকম দেখতে? ভয়ঙ্কর রূপসী? আহা-মরি-ক্লাসের?' আমি টান্ হয়ে বসি আমার চেয়ারে। সৌন্দর্যেব টান একটা আছেই তো!

'আহামরিই বটে! টুনটুনির একটা কথাও মিছে নয়। যেমন অপরূপ দেখতে, তেমনি নিজের গুণপনা দেখাতে। আদর কবতেও পেছপা নয়। সব বিষয়েই ওস্তাদ। সত্যিই।'

আপনি জানেন না !

'বলো কি হে ?' শুনে আরো শুনতে আমি উন্মুখ হই। পরের মুখের ঝাল খাওয়ার মতন হলেও, ম্রিয়মাণ হয়েও, পরের মুখের ঝালানো অমিয়-কাহিনী শুনতে হয়।

'কী বলবো ভাই····' বলতে গিয়ে সে চুপ করে। সহসা যেন মুখর হতে পারে না।

'সেই মেয়েটি গো।' তার সুন্দরা-কাণ্ডের আমি খেই ধরিয়ে দেই।

'হ্যাঁ, সেই মেয়েটি,' ঢোঁক গিলে সে জানায়—'আরেকটা কাকাতুয়া।'

'কাকাতুয়া ?'

'কাকাতুয়া বা কাকীতুয়া—যাই বলো।'

চার

মনোতোষের মনটা আজ বেজায় চওড়া। কালোবাজারে মোটা রকমের দাঁও পিটেছে। অন্য লোকের আয় হলে এটাকে সে বড়ই অন্যায় ভাবতো, কিন্তু নিজের হিতকে কে আর গর্হিত মনে করে?

মনে বড়াই নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ি ফিরলো মনোতোষ। পকেটের সঙ্গে মনের কেমন রহস্যময় যোগ আছে। পকেটে চড়া পড়লে মনেও চিড় খায়, আবার যদি সেটা দৈবাৎ ফেঁপে ওঠে, ফানুস হয়ে উঠতে দেরি হয় না মানুষের।

দিল্‌দরিয়া মনোতোষ বাড়ি ফিরেই ভাবলো বৌকে আজ খুশি করবে। কিছু আজ খরচ করবে ওর জন্যে। হোলোই বা নিজের স্ত্রী, নিজের স্ত্রীকে কি সুখী করতে নেই? পরস্ত্রীকাতর হওয়া দুনিয়ার দস্তুর হলেও, আর স্ত্রৈণতা নিতান্ত দোষের হলেও, কালেভদ্রেও, নিজের বৌকে কি ভালোবাসতে নেই? কদাচ কখনো সিনেমায়, রেস্তঁরায় নিয়ে গেলে, নিয়ে একটু বেড়ালে-টেড়ালে কী হয়? অপরা কাউকে ধরতে না গিয়ে নিজের বৌ নিয়ে সেই অপরাধই না হয় করলো সে আজ? করলো না হয় একদিন?

'কোথায় যাবে আজ বলো?' বৌকে বললো মনোতোষ: 'থিয়েটার, সিনেমা, ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল? কি লেক্ বা বোটানিকসে—কিম্বা বেড়াতে আর কোথাও? যা খুশি তোমার, যেখানে খুশি।'

'তাহলে তুমি আমায় সেই সাহেবি হোটেলে নিয়ে চলো,' জবাব দিল শ্রীলতা; 'সেই যেখানে তুমি খানা খেতে যাও রোজ।'

আপনি জানেন না !

'সেই চৌরঙ্গীর হোটেলে?'

'হ্যাঁ, খেয়ে দেখবো এমন কী খানা! যা খেয়ে বাড়ির রান্না তোমার মুখে রোচে না।'

বৌয়ের কথায় মনোতোষের মুখ যেন কেমন একখানা হয়ে ওঠে। সেখানে কি খানাই খালি? আরো কি নানান্ খানা নেইকো?

নিজের খোঁড়া পা নিয়ে (বৌকে কাঁধে করে আবার!) সেই খানার খাদে গিয়ে পড়তে সাহস হয় না মনোতোষের।—'সে যে সাহেবদের হোটেল গো? সাহেবসুবোরা খায়। তার চেয়ে চলো কোনো চীনে রেস্তঁরায় যাই। কিম্বা আম্‌জাদিয়ায় গেলে হয় না? তাদের মোগলাই খাবার-দাবারও বেশ তো।'

'হোলোই বা সাহেবি হোটেল—সেখানে তো বাঙালীরা যাচ্ছে আজকাল? মেয়েদেরও নিয়ে যায় বলে শুনেছি।' মোগল-চীনে উৎসাহ নেই শ্রীলতার। সাহেবি হোটেলটাই সে চিনে নিতে চায় একবার। সব গোল মেটাতে চায় এক মোকায়।

'বেশ, চলো তাহলে।' রাজি হতে হোলো মনোতোষকে। কথা দিয়ে ফেলেছে যখন, আর কথা দিয়েও তেমন অসন্তোষ নেই মনে—'আচ্ছা, তাই হোক তবে, যেতে চাইছো তুমি যখন। ছটার শো'য়ে সিনেমা দেখে তারপর যাওয়া যাবে, কেমন?'

সেন্‌ট্রাল অ্যাভিনিউর এক সিনেমায় সখ করে একটা পুরনো ছবিই দেখলো তারা ফিরে আবার।

মধ্য-বিরতির অবসরে মনোতোষ ফিস্ ফিস্ করে—'ছাখো, চৌরঙ্গীর

যে হোটেলটায় আমি খেতে যাই সেখানে—' বলে সে একটু থামে—'সেখানে কেউ ঘরের বৌকে নিয়ে যায় না বড একটা।'

'তবে কি পরের বৌকে নিয়ে যায়?' ফোঁস্ ফোঁস্ করে শ্রীলতা—'তুমি বুঝি তাই যাও?'

'আমি? না, আমি আবার কাকে নিয়ে যাবো? পাবো কোথায়? একা তুমিই আমার একশ যে!' পত্নী-স্তবেব একশা করে বসে মনোতোষ: 'সত্যি বলতে, এ-ভূভারতে তুমি ছাডা আর কে আছে আমার—'

'হয়েছে। থামো।' তোষামোদে ভোলার পাত্রী সে নয়। মনোতোষের আমোদের আমদানীতেই সে বাধা দেয়।—'কেন যে রোজ রোজ সেখানে যাও তুমিই ভালো জানো।'

'এম্‌নি খেতেই আমি যাই। অত রকমের ভালো-মন্দো খাবার আর কোথায মিলবে এখানে?'

'শুধু কি খেতেই যাও? পান কবতে নয়?'

'পান? সে তো নামমাত্র। নিমিত্তমাত্র। খাদ্যের সঙ্গে পানীয় একটা নিতেই হবে, সাহেবি হোটেলের দস্তুর! খেতেই হয় তাই একটু—সেইজন্যেই। তুমি যদি যাও আজ, তোমাকেও খেতে হবে।'

'আমি? মরে গেলেও নয়।'

'সেইজন্যেই তো বলছিলাম গো, সেখানে গিয়ে কাজ নেই। বয়গুলো আবাব এম্‌নি বয়াটে যে, খাবারেব সঙ্গে এক-আধ পেগ আনবেই।'

'পিক্‌দানীতে ফেলে দেব আমারটা' শ্রীলতা জানায়।—'টেরও পাবে না কেউ। তাহলে তো হবে?'

'পিকদানী কোথায় সেখানে?' মনোতোষের শ্রীমুখ পিকাসোর

ছবির মতই দেখা দেয়। পিকাসো যদি কোনোদিন পিক্‌দানি আঁকতেন।

'পিক্‌দানি না থাক্‌, অ্যাশ-ট্রে তো আছে? সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।'

শ্রীলতা স্বামীর দুর্ভাবনা দূর করতে চায়।

শো ভাঙলে জনতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়েই একটা ফীটন গাড়ি পেয়ে গেল তারা।

ফীটনওয়ালা সাদর অভ্যর্থনা জানালো ওদের—'আইয়ে জী সাহেব, আইয়ে।'

শ্রীলতা যেন পা তুলেই ছিল, কিন্তু মনোতোষ কেমন একটু উন্মন। —'এইটুকুই তো পথ,' বল্লে সে—'হেঁটে গেলেই হবে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে—চৌরঙ্গী। এই মোড়টা পেরিয়েই। এসব রাস্তায় বেড়াতেই আরাম।'

'মাথা-খোলা ঘোড়্‌গাড়িতে চাপি নি কখনো। অনেকদিনের সখ আমার যে—'

'তাহলে ওঠো।' তাহলে মনোতোষের কোনো আপত্তি নেই। বৌয়ের সবরকম সখই সে মেটাবে আজ, তাকে সখির মতোই জ্ঞান করে'।

'চৌরঙ্গীর একটা সাহেবি হোটেলে নিয়ে চলো আমাদের।' হুকুম দিল মনোতোষ।

'জী হুজুর। সম্‌ঝ গিয়া।' সম্‌ঝানি দেয় গাড়োয়ান।

হোটেলের সামনে এসে খাড়া হতেই মনোতোষ যেন খাঁড়া হয়ে

ওঠে—'আহা, এখানে কেন? এখানে কে আনতে বল্লে? চৌরঙ্গিতে কি আর কোনো ভালো হোটেল ছিল না?' ধমক্ লাগায় সে ফীটন-ওয়ালাকে।

শ্রীলতা কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে—'এটাও একটা বিলিতি হোটেল তো? এখানেই চলো না। যাহোক একটা হলেই হোলো। কেন, এখানে কি তুমি খাও না কখনো?'

মনোতোষ একটু ইতস্তত করে নামে বৌয়ের সাথে—'কম। খুব কম। তবে হ্যাঁ, বিলিয়ার্ড খেলতে এসেছি বটে মাঝে সাঝে। কখনো সখনো।'

হোটেলে পা দিতেই একটি বয় আগু বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে—'আসুন মিত্তির সাহেব, আসুন।'

'লোকটা তোমায় চেনে দেখছি।' শ্রীলতা একটু অবাক হয়। —'বেশ ভালো করেই চেনে।'

'আমাদের আপিসের বেয়ারা। ছুটির পরে এখানে বয়ের কাজ করে' বাড়তি কিছু উপায় করে। দেখচ না, কিরকম বেয়াড়া বেয়াড়া ভাব।'

শ্রীলতা ভালো করেই দেখেছে। যদ্দূর বেয়াড়া হতে হয়। আপিসের বেড়া ডিঙোবার জন্যই হয়ত বা।

নানান্ খানা-টেবিলের ঘোরপ্যাচের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে তারা। যেতে যেতে এক সুবেশিনী তরুণীর সামনে পড়ে। মেয়েটি এক সুবেশ যুবকের পাশে বসেছিলো টেবিল আলো করে'।

'ভালো আছেন মিস্টার মিত্র?' সহাস্য সম্ভাষণ মেয়েটির।

'হ্যাঁ, আপনিও বেশ ভালো তো?' কাষ্ঠহাসি হেসে কেটে পড়তে

চায় মনোতোষ।—'আমাদের আপিসের লেডি-টাইপিস্ট।' শ্রীলতাকে জানায়—একটুখানি এগিয়ে গিয়ে।

'তোমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে দেখছি।' শ্রীলতা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় তার দিকে—'কেমন ঢং করে মিস্টার মিত্র বলে ডাকলো···'

সম্বোধনের সুরে মিত্রতার বেশ বেশ পরিষ্কার। ঢাকবার উপায় নেই। ঢাকা দেবার চেষ্টাও করে না সে।—'এক আপিসে কাজ করি, রাখতেই হয় ভাব। মেয়েটা আবাব আমাদের বড়কর্তার ভারী পেয়ারেব।'

বড়কর্তার বৃহৎ ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে চায় সব মোট—সমঝ্‌দারি-হাসি হেসে। কিন্তু গুমোট বুঝি তাতে কাটে না।

একটা ছোট্ট টেবিল দখল করে বসে দুজনে। খাবারের তলব দেয়; কিন্তু জমাটি হয়ে না বসতেই—

'এই যে, মিত্তির যে?' ওপাশের টেবিল থেকে হাঁক আসে। আরেক ঢিত্তির! আবার বুঝি সব মাটি?

একটুক্ষণের জন্যে তার টেবিলে গিয়ে বসতেই হয় মনোতোষকে।

বামালের বখ্‌রাদারি

'খাসা মেয়েকে তো নিয়ে এসেছো আজ হে?' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওর বন্ধু।—'বলি, জোটালে কোত্থেকে?'

'আরে বৌ যে!' ব্যস্ত হয়ে বলে মনোতোষ। উৎসাহের উৎস-

মুখেই চাপা দেবার চেষ্টা ওর। কী জানি, ওর কথা যদি শ্লীলতা আর শ্রীলতার সীমা লঙ্ঘন করে। বৌয়ের কানে পৌঁছয় যদি।

'বৌ যে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কার বৌ, সেই কথা। তবে আমাদের মত ঘরপোড়া গরু কি আর ঐসব সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় হে? বলি, কোত্থেকে বাগালে এটিকে?'

'আমার বৌ।' গম্ভীর হয়ে ওঠে মনোতোষ।

'কে বলেছে? আমাকে ওর ঠিকানাটা দেবে? দেখব একবার বেয়ে চেয়ে—চেষ্টা-চরিত্তির করে'—তুমি যা হিংসুটে বাপু, তুমি তো আর পাইয়ে দেবে না—'

মনোতোষের টেবিলে খানা এসে পড়াতে সে ছাড়া পায়। হাঁপ ছাড়ে নিজের টেবিলে এসে।

'ঐ অসভ্য লোকটা কে গা?' জিগেস করে শ্রীলতা।

'আমাদের আপিসের—'

'বুঝতে পেরেছি। আর বলতে হবে না।'

কী যে সে বোঝে, সেই জানে। মনোতোষকে বুঝতে দেয় না। গোমড়া মুখে এটার সেটার থেকে একটু-আধটু চাখে। খাওয়ার তার রুচি যেন নেইক আর।

আরো মনমরা হয়ে পড়ে মনোতোষ। ঘরজোড়া ঔৎসুক্য, যে কোনোধারে তাকালেই চোখে পড়ে। জোড়ায় জোড়ায় চক্র—জোড়ে-বিজোড়ে। আর চক্রে চক্রে ঘর্ঘর। সেই ঘর্ঘর-ধ্বনি যতই অনুচ্চ হোক্, অনুচ্চারিত থাক্—তার ঘরণীকে নিয়েই যে, যতই সে রোখো হোক্ না, টেবিলে-টেবিলের-চক্রান্ত থেকে বুঝতে বেশি বেগ পায় না।

উদ্বেগ পায়। চক্‌চকে চোখ চারধারে—ধারণাতীত চাকচিক্যে উদ্ধত। চোখা চোখা মুখ আর চোখে চোখে মুখরতা। এই খানাকুল কৃষ্ণনগরে কুল্লে একটিই যেন রাধা আজ—সবার আরাধনার। সমস্ত ধার ধারালো হয়ে ঘনিয়ে আসার আগেই শ্রীলতাকে নিয়ে সে সরে পড়তে চায় এখান থেকে—এই খানা-খন্দ বাঁচিয়ে, এখানকার বিশ্রী পরিবেশ থেকে—অটুট থাকতে থাকতেই—সব কিছু সঙ্গিন হয়ে ঘোরালো হয়ে উঠবার আগেই। জীবনসঙ্গিনী নিজেই যদি সঙ্গিন হয়ে ওঠেন, তাহলে তো আর বাঁচন নেই! আমরণ তার খোঁচা।

শেষ কিলোমিটার !

'হ্যালো, মিটার ! ডার্লিং !' রণস্থল থেকে বেরুবার মুখে শেষ কিলোমিটারে এসে আরেক কেলি! আবার এক সঙ্ঘর্ষ। খোঁড়া পা-খানাই খানায় পড়ে আবার! ইঙ্গিতে আর ভঙ্গীতে তরঙ্গিত হয়ে মেম্‌টি যেন ওর গায়ের ওপরে গড়িয়ে পড়ে। কোনো-রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সে পালায়।

ফীটন গাড়িটা তখনো ছিল দাঁড়িয়ে। শ্রীলতা যন্ত্রচালিতের মতই গিয়ে ওঠে। —'যা মাথা ধরেছে, বাবাঃ!'

'ময়দানের হাওয়া খেলেই ছেড়ে যাবে।' মনোতোষ বলে।

'হাঁ, সব ঠাণ্ডা হোবে।' কোচ্‌মানও উৎকোচ-দানে বিরত হয় না।

রেড রোড ধরে গাড়ি চলে। খানিক বাদে, মাথা ছাড়ে কি না বলা যায় না, কথা ছাড়ে শ্রীলতার—'রঙ্গিণীটি কে? তোমার আপিসের কেউ?'

কোচ্‌মানের উৎকোচদান

না। এবার তার আপিসের নয়। আপিসের বাইরে তার যে এক আলাদা ব্যবসা আছে, কালোয়াতির বাজারে—সেই ওস্তাদি-কারবারে যিনি তার অর্ধেক অংশীদার—তাঁরই অর্ধাংশিণী ইনি। সেই ভদ্র-লোকেরই পরমার্ধ, পরমার্থ।

'রঙ্গিণী তো নয়, চৌরঙ্গিণী!' মুখ ফোটে শ্রীলতার।—'বুঝতে পেরেছি, ইনিয়ে বিনিয়ে আর বলতে হবে না তোমায়।' ফোড়ন কাটে সে।

আপনি জানেন না !

'কী বুঝেছো শোনাই যাক্ তো !' আক্রমনাত্মক আত্মরক্ষায় সেও এবার একটু চড়বড় করে ওঠে—বৌয়ের ফোড়নেই।

'কী বুঝেছি শুনবে ? যখন তুমি হোটেলের বয়কে তোমার আপিসের বেয়ারা বলে চালালে আমি অবিশ্বাস করিনি। তারপর সেই রসবতীকে বল্লে তোমাদের আপিসের টাইপিস্ট্, তাও আমি বিশ্বাস করেছি। আর সেই হতচ্ছাড়া হাভাতেটা তোমায় ডাকলো—যে নাকি তোমাদের ক্যাশিয়ার না কে, তখনো আমি কোনো সন্দেহ করিনি।...'

বৌয়ের অভিযোগের ফিরিস্তি বাড়ে, মনোতোষ কোনো জবাব দিতে পারে না, আ-স্বামী-সুলভ আম্‌তা আম্‌তা ছাড়ে।

শ্রীলতা তার নাম্‌তা আওড়ায়—'সবই মান্‌লুম, সমস্তই, কিন্তু—কিন্তু—ঐ রঙমাখা পটের বিবিটি যে তোমার অংশীদারের বৌ, একথা আমি কিছুতেই মানতে পারবো না। একথা আমি বিশ্বাস করবো না মরে গেলেও। অমন বিচ্ছিরি আখ্‌খুটে মেয়ে যে কারু—'

কোচ্‌মানি মেহেরবানী !

এমন সময়ে ফীটনওয়ালা তাদের মধ্যে মাথা গলায়—'মিটিয়ে দিন্ না বাবু। যা দিবার দিয়ে ছোড়ে দিন্ না ওকে। হামি আপনাকে আচ্ছা আওরতের কাছে লিয়ে যাবে। রোজ যেমন লিয়ে যাই ?'

পাঁচ

নারীমেধ থেকে আনাড়িমেধ—বিরাট এক পঞ্চম বেদ। জ্ঞানকাণ্ড আর কর্মকাণ্ড দুই জড়িয়ে ···! ক্রিয়াকাণ্ডে গিয়ে কখনো হয়তো একটু বেদনার মতই মনে হবে, কিন্তু তা হলেও ·পুলকেশ ব্যাখ্যা করে ··ওই দুই নিয়ে · ··

হ্যাঁ, নারী আর আনাড়ি। তেল আর নূন তরকারীর পক্ষে যেমন দরকারি তেমনি জীবনকে রসালো করতে ঐ দুটি। আনাড়ি হচ্ছে জীবনের লবণভাগ, বেশিমাত্রায় হলে বিষবৎ, কিন্তু বিশেষমাত্রায় বেশ। আসল রসের আস্বাদ পেতে হলে ওর একটু না হলে একেবারেই চলে না। আর, পৃথিবীর এই কর্মপ্রবাহের চক্রান্তরালে সবকিছু চালু রাখতে মসৃণ রাখতে যে-তেল সে আর কে? সে-ই তো নারী। সেই তৈলশ্রী শ্রীময়ী নারীর।

স্নেহ-পদার্থের জন্যেই নারী। আনাড়িরা অপদার্থ। কিন্তু আনাড়িরা না থাকলেও দুনিয়া অচল। ওদের ঘাড় ভেঙে টাকা উপায় করো, তারপরে সেই টাকা খরচ করো শ্রীমতীদের পেছনে। তোমার ঘাড় ভাঙবার সুযোগ দাও তাদের। তার জন্যে বেশি কষ্ট পোহাতে হবে না, তাঁরা কণ্ঠলগ্না হলে ঘাড় আপনিই ভাঙে। আরামেই মট্‌কায়।

মোট কথা, আনাড়িদের অপব্যয়ে তোমার উপায়, তারপরে নারীদের সাথে উপব্যয়ে আবার তুমি নিরুপায়। তখন ফিরে ফিরতি ফের আনাড়িদের ঘাড়ে ভর। একটা পরি-চ্ছেদের পরে আরেক স্কন্ধ। পর আর পরি—পরম্পরায়। প্রিয়জন আর প্রয়োজন। তেল আর নূন। দুয়ে মিলে ইহলোকের মাধুর্য আর চাকচিক্য।

আপনি জানেন না !

পুলকেশ এই সব তত্ত্ব অনুকূলকে পরিপাটিরূপে বোঝাচ্ছিল। অনুকূল গোড়ার দিকে একটু ঘাড় নেড়েছে, তার মনে হয়েছে, না, ঠিক নয়। একেবারে ঠিক ঠিক নয়। আনাড়িত্ব কিছু নারীত্বের মতই জন্মগত না। নারীরা বর্ণ, কিন্তু আনাড়িরা হচ্ছে মেড্—কবি আর ফুল্‌কবির মতই। নারীরাই আনাড়ি বানায়। কেননা, আনাড়িদের না হলে নারীদের চলে না। নারী যদি স্বরবর্ণ হয়, তবে আনাড়ি ব্যঞ্জন—আনাড়ির ঘাড়ে চেপেই নারীর সার্থকতা। তার ঐশ্বর্য, তার স্বর্গীয় তা—তার ব্যঞ্জনা। আর. চাপিত হয়ে আনাড়িরও স্ফূর্তি,—স্বর্গই বুঝি তার। চন্দ্রলোকের বিন্দুত্বলাভ। পরিলোক আর পরলোক একাধারে।

কিন্তু এমন তার অনড় ধারণাও পুলকেশের ব্যাখ্যানায় টল্‌লো। ঘাড় নেড়ে সে বল্লে—'আমিও তাই ভেবেছি। ভেবে ঠিক করেছি যে—আমি চাই তোমার একটু তেল হোক—'

'তার মানে?' চক্‌চকানো তত্ত্বকথার মাঝখানে অকথ্য এই তৈলাক্ত আমন্ত্রণে পুলকেশ হকচকায়।

'তার মানে, আমাদের কলেজে সহশিক্ষা শুরু হয়েছে বছর চারেক, কিন্তু মফঃস্বলের মেয়েদের তো নেয়া হয়নি য়্যাদ্দিন। জায়গার অভাবেই। এই সেসন্ থেকে নেয়া হবে ঠিক হয়েছে, জানো তো? এবার খালি যে সদরের মেয়েরাই আমাদের সঙ্গে পড়বে তাই না, জেলার যতো মহকুমা খালি করেও আসবে আবার। তারা সব থাকবে কোথায়?' ডিমের মতই প্রশ্নটা পাড়ে অনুকূল—তেমনি গোলাকার, গোলমেলে এক জিজ্ঞাসা এনে ফ্যালে।

'থাকবে কোথায়, তার আমি কী জানি!' এই ঘোর সমস্যার এমন ঘোরালো পরিবেশনও পুলকেশ এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

'এ জেলায় তো এই একটিমাত্র কলেজ। তারা যাবে কোথায় শুনি?'

'যেখানে খুসি।' তারপরে একটু ভাবতেই যেন একটা হদিশ মেলে—'শ্বশুরবাড়ি যাক্ না।'

'খোঁজ পেলে তো? আপাতত তারা আমাদের সঙ্গে পড়বে। এই ঠিক হয়েছে। ...সেই ঠিকানার খোঁজ খবর নেবার জন্যেই কিনা কে জানে!'

অনুকূলের আনুকূল্য

'আট্‌কাচ্ছে কে?' অন্তত সে যে এ-ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে তা পুলকেশের বোধ হয় না।—'পড়ুক না, আপত্তি কি?'

'কতো সুন্দর সুন্দর মেয়ে আসবে আমাদের শহরে। মফঃস্বলের কতো গাঁ, কতো ঘর আঁধার করে। এক পাল মেয়ে। তাদের সবার সাথে যদি এক তালে তোমার পরিচয় হয়ে যায় কেমন হয় বলো তো?'

অবিশ্বাস্য হলেও, কথাটা ভেবে ছাখে পুলকেশ। এমন পরিস্থিতি, লটারি-জেতার মতই সুদূরপরাহত হলেও আপাতদর্শনে মনে হয় ভালোই হয়, কিন্তু ভালো করে খতিয়ে দেখলে কম ভাবনার নয়।

পুলকেশ ভাবে। চক্ষের পলে এক পাল মেয়ের চাক্ষুষ পরিচয়লাভ

আপনি জানেন না !

অনেকটা পলকে প্রলয়ের মতই না? পালে পালে কি মেয়েদের দেখা যায়? অন্তত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তো নয়। রূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লক্ষ্য করতে হলে তিলে তিলেই দেখতে হয়, সেটা তলিয়ে দেখবার।

মোগল হারেমে এক গাদা মেয়েকে এক তালে দেখা যায় বটে (মানে, দেখা যায় বলে শোনা যায় বটে,) সে-দিব্যদৃষ্টি তুর্কীর বাদ্‌শার। সেই হারে মেয়ে দেখায় aim থাকে না, সুন্দরীদের হট্টগোলে সৌন্দর্য গুলিয়ে যায়। সেই হারের দর্শনে দর্শকের নিতান্ত হার, তবে বাদ্‌শা হতে পারলে ফুর্তিটা পোষায়। কিন্তু বাদ্‌শা বা বাদ্‌শাজাদা না হয়ে তেমন জেয়াদা রকম দেখতে যাওয়া নিজের সঙ্গে বাদ সাধা ছাড়া আর কী?

মেয়েরা আলাদা আলাদা দেখবার, একটা একটা করে'—একটু একটু করে'। একান্ত করে'—একলা। তিলে তিলেই দেখতে হয়, এক তিলও তার বাতিল করার নয়। এই কারণেই তাঁরা তিলোত্তমা, প্রত্যেকেই। এক হাজার রূপসীকে এক বাজারে আনা, মেট্রগোল্ডউইন্ মেয়েরের নাচগানের ছবিতে দেখা যায় বটে—কিন্তু মেয়েদের কি খুঁটিয়ে দেখা যায় সেই হুল্লোড়ে? চোখকে কি চারধারে খাটানো যায় একসঙ্গে—মশারির মতই? সেই রূপছত্রের বাঁশবনে মশাই, পুলকেশ তো ডোমকানা; তেমন নারীরাজ্যের থেকে চিত্রাঙ্গদাকে বেছে নিতে পারে শুধু শ্যেনদৃষ্টি অর্জুন। রূপালী বাণীচিত্রের গদাঘাতে জর্জর বেচারা পুলকেশকে নিছক ইন্‌সেন্-দৃষ্টি নিয়ে ফিরতে হয়।

মেয়েরা আলেয়া হলেও, তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলো। আলাদা আলাদাই তারা দেখবার,—নিরালায়। গোলে হরিবোল হতে পারে, কিন্তু রাধার বোল জমে না; আরাধনার তাল কেটে যায় তাতে। মেয়েদের হরিহাটে কোনো পুলক নেই, পুলকেশও নেই।

সব শুনে টুনে অনুকূল বল্ল, 'তা বেশ, তুমি যদি না যাও তো আমিই যাবো। কিম্বা আর কোনো আনাড়িকে খুঁজে দেখতে হবে। মানে, তোমার মতন নারী-জ্ঞান-ওয়ালা যখন একাজে এগুতে নারাজ তখন বাধ্য হয়ে আমায়—'

'বারে, আমি কি যাবো না বলেছি? অনুকূলকে প্রতিকূল হতে দেখে পুলকেশ যেন অকূলে পড়ে—'আমি শুধু লাভলোকসানের হিসেবটা কষছিলাম বইতো না।'

'তাই কষতে থাকো। তোমার ভাগে কষই থাক্, রস জমুক অপরের বরাতে। তুর্কীর কোনো বাদ্‌শা না হয়েও তুমি—বলতে আমি বাধ্য—তুমি আস্ত একটি হারুণ-অল-রসিদ। একচোটে সমস্ত রস—সব রসিকাকে হারাচ্ছো অবহেলায়।'

অবহেলার কথাটা পুলকেশের প্রাণে লাগে।—'আহা, চোট্‌ছো কেন? আমি কি হারাতে চেয়েছি?' কাঁদো-কাঁদো হয়ে সে বলে।—'হারাবো বলেছি আমি?'

'তুমিই চাউড করো যে, নারীদের জন্যই তোমার জন্ম, না কি নারীদের জন্মই নাকি তোমার জন্যে—তুমি নাকি আনাড়ি নও। তাই তোমার নারীজন্ম সার্থক করতেই বলা আমার। নইলে—'

'বেশ ত বেশ ত, আমি রাজি।' পুলকেশ ব্যস্ত হয়ে বলে—'কী করতে হবে বলো আমায়। খোলসা করে বলো সব।'

'করবে আবার কী! মেয়েদের থাকার জন্যে যে-হোস্‌টেল ঠিক হয়েছে সেটাকে একটু ঠিক ঠাক করা—তার ঘরদোরগুলো একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। জায়গাটা তাদের এসে দাঁড়াবার মতো হয়েছে কিনা সেইটা গিয়ে দেখা কেবল। কোথাও কিছু খুঁত টুঁত থাকলে শুধ্‌রে

দেয়া আগে ভাগেই, এইতো। মেয়েরা সব আজকেই এসে পড়বে,—আজ বিকেলেই কিনা !'

'তাই বলো। তদারকের কাজ।'

'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই বলছিলেন জন-মজুর লাগাতে। আমি বল্লাম, কী দরকার তার ? ঘরদোর ফিট্‌ফাট্ করা—ভারী তো কাজ ! তা আমরাই তো রয়েছি। বোনদের কাজে ভাইরা লাগবে, লজ্জা কি তাতে ? অকারণ বাজে পয়সা নষ্ট করা কেন ? আমাদের হোস্‌টেল থেকেই ছেলে যোগাড় করে নেব—কোনো কষ্ট নেই। আমিই ম্যানেজ করে নেব বলেছি—জানি তো যে, মেয়েদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবকের অভাব হবে না।'

'আর কোনো ছেলেকে বলেছো না কি ?'

'না। বলিনি এখনো। তোমাকেই বলছি সকলের আগে। তুমিই এ কাজের সব চেয়ে যোগ্য বলে আমার মনে হোলো। মেয়েদের সাথে যোগাযোগ হবার এমন সুযোগ তুমি ছাড়বে না আমি ভাবলুম। তবে তুমি যদি না চাও—না পারো—তখন—তাহলে—'

'পারব না কি বলেছি আমি ?' পুলকেশ বাধা দিয়ে বলে।

'তাছাড়া, তুমিই আমাদের মধ্যে সিনিয়রমোস্ট্। প্রায় এক যুগ-ব্যাপী তোমার কলেজ-জীবন, নয় কি হে ? তুমি থাকতে এসব কাজে ফার্স্ট্ ইয়ারের চ্যাংড়াদের লাগানো কি উচিত ? বাচ্চারা মেয়েদের দাম কী বোঝে ? মেয়ে চেনে তারা ? তারা জানে চিংড়ির কাটলেট আর চীনেবাদাম ! হ্যাঁ, ভাই পুলকেশ, এবার তোমার ফোর্‌কোর্থ ইয়ার, তাই না ?' অনুকূল কিম্বদন্তিটা ঝালিয়ে নিতে চায়।

হ্যাঁ, তাই বটে, পুলকেশ খতিয়ে দেখে। নিজের Loveক্ষতির

খাতায় হৃদয়ের ক্ষতবিক্ষতির হিসেব করে। হ্যাঁ, এই ফোর্থ ইয়ারেই তো রয়েছে সে আজ চার বচ্ছব। বছর চারেক হোলো কলেজে সহ-শিক্ষার পাট সুরু, আর সেই থেকেই তার এই অসহনীয় পরীক্ষা। একটার পর একটা এগ্‌জামিনেশন্‌ তাকে পাশ করে যাচ্ছে, পাশিয়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু কোনোটাই সে পাশ করতে পারছে না। এতাবৎ পরীক্ষার পড়া যত না পড়েছে তত সে পড়েছে প্রেমে। ফলিং ইন্‌ লাভ আর ফেলিং ইন্‌ লাভ—ক' বছর ধরে পাল্লা দিয়ে চল্‌ছে তার ক্রমাগত। দোনো পাল্লাই ভারী, তবু হাসিমুখেই সে-ভার বহন করছে সে।

'তুমি একাই পারবে, না, তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক ছেলে দেব আরো—তোমাকে সাহায্য করবার?' অনুকূল জিগ্যেস করে।

'ভারী তো কাজ!! একলাই আমি পারবো, এর মধ্যে আবার ফের আনাড়িদের আনা কেন?' গেরোস্থালির কাজে, পুলকেশের ধারণায়, ফার্স্ট্‌ ইয়ারের ইয়ারদের নিয়ে আসা খালি গেঁবোই হবে, কোনো কাজ হবে না।

নাড়ী আর আনাড়ি—উভয়ই চোখা লোকের ধার-পরীক্ষার জায়গা বটে, যেমন চন্দন আর আমকাঠ দুই হচ্ছে অগ্নির সমিধ, কিন্তু সাধ করে কেউ চাঁদের রাজ্যে আকাঠ আনে? যত বড়ো যোগ্য লোকই হোক্‌, অশ্বমেধ আর রাজসূয় দু দুটো যজ্ঞ করতে পারে এক সঙ্গে? নারীমেধ আর আনাড়িমেধ কি এক সাথে হয়? না, পুলকেশ চাঁদোয়ার তলায় বাঁদরের আমদানিতে রাজি নয়। দক্ষতা থাকলেই যে দক্ষযজ্ঞ করতে হবে তার কী মানে আছে?

'আমিও তাই বলি।' অনুকূল বলে—'যখন মেয়েরা আসবে তখন যেন একলা তোমাকেই পায়। দেখতে পায় যে শুধু তুমিই আছো।

ছাঁতনাতলায় ঠিক না হলেও—এও একরকমের শুভদৃষ্টিই তো ? প্রথম দর্শনে প্রেম বলে একটা কী যেন আছে না ? যেটা প্রিয়দর্শনের প্রথম-কথা ? সেখানে চারিচক্ষের মিলন-স্থলে যদি ছয় কি বারো চোখ জড়ো হয় সেটা—'

'অতোটা বাড়াবাড়ি হলে সব নয় ছয় হয়ে যায়—ভাই !' অভিজ্ঞের মতই ঘাড় নাড়ে পুলকেশ। ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

'তাহলে তুমি একলাই যাচ্ছো ?···এখুনিই যাও তাহলে কখন্ তারা এসে পড়ে ঠিক তো নেই ! তার আগেই সব ঠিকঠাক করে রাখা ভালো। হ্যাঁ, ভালো কথা, বাল্‌তি আর ঝাঁটাগাছটাও নিয়ে যেয়ো মনে ক'রে, ভুলো না যেন।'

ঝাঁটাবাল্‌তি হাতে সেখানে গিয়ে পুলকেশ ঘরদোরের যে হাল দেখল তা অকথ্য। ক'খানা ঘর, কিন্তু তিন ইঞ্চি করে ধূলো জমে প্রত্যেক ঘরে। আর, কী নোংরা মেজেয় ! আল্‌তোভাবেই পা ফেলা যায় না, আল্‌তা-পা সেখানে পড়বে কি করে ভাবাই দায়।

উঠে পড়ে লাগতে হোলো তাকে। ঘরগুলোর ধূলোবালি ঝেঁটিয়ে দূর করলো আগে। আবর্জনা হটিয়ে, তারপর বাল্‌তির পর বাল্‌তি জল ঢেলে সাফ্ করলো সব।

এইবার ন্যাতা দিয়ে মেজেটাকে তক্‌তকে করে তুলতে হয়। কিন্তু ন্যাতা এখন পায় কোথায় ? নিজের শার্টটাকে খুলে লাগালো ঘরমোছার কাজে। স্বার্থত্যাগ সর্বদাই প্রেমের পথ পরিষ্কার করে—ভালোবাসার সেইটাই নাকি রাজপথ (ওরফে, রাণীপথ)। শার্ট ত্যাগ করে সেই শর্টকাট্ ধরলো পুলকেশ।

তারপর পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হোলো তার। কিন্তু মেজে কমখানি না। কখানা ঘরকেই তো মাজতে হবে। জল ঢেলে আর ন্যাতা বুলিয়ে—শ্রেফ নিজের বাহুবলেই সম্মার্জিত মেজেগুলিকে মেজে ঘষে তুলতে হবে ঝক্‌ঝকে করে'। পুলকেশ মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে—উঠে পড়ে ন্যাতা চালায়। ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি—বলেছে শাস্ত্রে। নারীর খাতিরে ভূমিসাৎ হয়েও সুখ। কিন্তু তার মনে হয়, এতটা ভূমিকর্ষণের সুখ ঘাড় পেতে না নিলেই বুঝি ভালো করতো। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই জীবের দুঃখ সুরু, শাস্ত্রের একথাও তো মিথ্যে নয়। এমন কি, এক একবার নিজেকেই তার আনাড়ি বলে বোধ হতে থাকে। অনুকূলের আনুকূল্যে, নিজের ওপর দিয়ে তার নিজেরই এই আনাড়িমেধ নয় তো?—একেকবার এমনো সন্দেহ জাগে। চারখানা ঘর পৌঁছার পর পঞ্চমখানায় পৌঁছে কেবলি তার মনে হয়, না, না, এ নয়, এমনটা নয়—এ মোটেই ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু বৈরাগ্যসুলভ নেতিবাদ জাগলেও ন্যাতা বাদ দিতে সে পারে না। নেতাতে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে, তবুও চালাতে হয় ন্যাতাগিরি—রীতিমত কান্না পেতে থাকলেও। এতক্ষণ ধরে এতখানি মার্জনার পর নিজেকে আর সে মার্জনা করতে পারে না।

পাণি-পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ!

কিন্তু নেতৃত্বের মধ্যপথে থামা তো চলে না, চালাতেই হয়। তার নৈতিকতার অবসরে নিঃশব্দচরণে কখন যে এক পরির আবির্ভাব হয়েছে তাও সে টের পায় না। এক রোখা নিজের আন্দোলন চালায়।

'ওমা, এই ছিরি নাকি ঘরদোরের !' মেয়েটি আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, চেঁচিয়ে ওঠে।

আওয়াজ পেয়ে চমকে ওঠে পুলকেশ—ত্যাঁ ?

মেয়েটিকে দেখে সে আরো বেশি চমৎকৃত হয়। ন্যাতা হাতে নিল্‌ডাউন অবস্থায় সে মেয়েটিকে ছাখে। হ্যাঁ, চেয়ে দেখবার মতোই বটে মেয়েটি। হাঁ করে দেখবার মতোই। এতক্ষণের মাজাঘষায় তার নিজের মাজায় খিল্ ধরে গেছল, কাজেই সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ন্যাতাজোবরা হয়ে আধবসাই থাকে, বসে বসে চায় মেয়েটির দিকে।

অভাবনীয় পরি-স্থিতি !

মেয়েটিও চায়। তার দিকে তাকিয়ে সে চোখ নীচু করে। চারিচক্ষের মিলই হয়ত হবে, কিন্তু ব্রীড়াবনত নয় বুঝি ঠিক

পুলকেশ হাঁটুগেড়ে বসা আর মেয়েটি খাড়া দাঁড়ানো, বাধ্য হয়েই তাকে আনত-নেত্রে তাকাতে হয়।

'এই পরিষ্কার হয়েছে এতক্ষণে?' মেয়েটিব বলার ধরণে যেন একটু অসন্তোষ ব্যক্ত হয়।

স্বভাবতই প্রাণে লাগে পুলকেশের। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্—কিন্তু সেই-তাঁর তুষ্টি-যজ্ঞে যতো ঘিই ঢালো, সমস্তই ভস্মীন। তার মার্জিত-রুচির পরাকাষ্ঠা—এমন শার্টান্ত খাট্‌নির পব এই সার্টিফিকেট—তার অহংবোধে আঘাত করে। ঘরের এবং নিজের সে এক সাথে সাফাই দেয়—'আর-সব ঘর তো সাফ্ হয়েছে, শুধু এই হল্‌টাই এখন বাকী আছে কেবল।'

'কদ্দূর এগুলো, লেডি-সুপাব দেখতে পাঠালেন আমায়'—বলতে যায় মেয়েটি।

'তা, আপনারা আসতে পারেন।' কথাটা লুফে নেয় পুলকেশ—'আসতে পারেন এবার। এই একটা মেজেই বাকী তো। দেখতে না দেখতে মেজে ফেলবো। ধোলাই হয়ে যাবে আপনারা পা দেবার আগেই।' পরিদের আসার পথ সে পরিষ্কার করে—'আর সব মেয়েরা কি এখুনি আসছেন?'

'মেয়েরা আসতে সেই পরশু। কাল বিকেলে হয়ত কিছু আসতে পারে, তা বলে' বাপু, তোমার কাজে যেন কোনো গাফিলি কোরো না।...'

হুকুম দিয়েই মেয়েটি চলে যায়, এক মিনিটও দাঁড়ায় না, ফিরেও তাকায় না ওর দিকে।

—'চট্‌পট্ সারো একটু, বুঝলে?' চটাপট্ ওর স্যাণ্ডাল্ চলে—সেই

আপনি জানেন না !

তখন থেকে এমন পরিশ্রমের জলাঞ্জলির পর—স্বপ্নের মত উজ্জ্বল করে তোলা পুলকেশের এতক্ষণকার আমেজের ওপর দিয়ে।

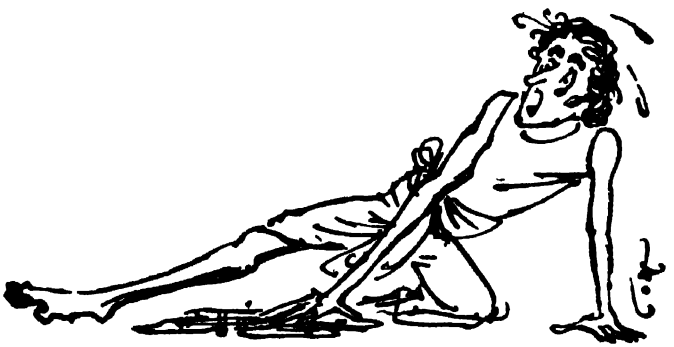

ছয়

দক্ষিণার আমদানি লেখকজীবনে দক্ষিণ হাওয়ার মতই বিরল। আর, তেম্‌নিই মৃদুমন্দ। মন্দার বাজারে সম্পাদকদের দাক্ষিণ্য মন্দীভূত আরো। তাই মনে করলাম—

মনে কিছুই করিনি, এক ব্যবসাদার—নামজাদা বাল্‌তির ব্যাপারী—প্রচারসচিব চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম। তখন মনে পড়লো, একদা···

'শ্রী আর বিশ্রি—বাজারে দুই প্রকারের ঘি। কোন্‌টি আপনার পছন্দ?' ক দেখে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ন্যায় প্রহ্লাদী প্রেরণায়, ঘিয়ের নামে শ্রীকার দেখে ঐ লাইনটি মনে এসে গেছল হঠাৎ! এসে, কিছুতেই আর যেতে চায় না মন থেকে। প্রথম-গজানো প্রেম আর গোঁফের মতই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে। কথাটার কী গতি করি ঠিক করতে না পেরে শ্রী-ঘৃতের ঠিকানাতেই ওটাকে পাঠিয়ে দিলাম একদিন—কিছু না ভেবেই।

পাঠিয়ে ভুলে গেছি। কিন্তু ·

অযাচিত পাঠানোর কিছুদিন পরেই অভাবিত এক চেক্ এসে হাজির—এক ক্রস্ চেক্—ক্রস্ ষ্ট্রীটের আড়ত থেকে। একটি লাইন লেখার জন্যে একশো টাকার বেশি পেয়েছিলাম, মনে আছে আমার। শ্রী-যুত ঘিয়ের কর্তাদের ধন্যবাদ-জড়িত অনুপ্রেরণা, ভাবতে বেশ লাগে এখন। ভাবলে আবেশ লাগে এখনো।

লেখকজীবনের সেই উঠ্‌তি বয়েস। একশো টাকায় তখন বইয়ের কপিরাইট বেচি, আর পাঁচ হাজার লাইনের কম কি কোনো বই?

প্রুফ দেখতে দিলে বাড়ে আরো, আরো ইম্‌প্রুভ্‌ হয়—লেখার দিকে না হলেও লাইনের দিকে তো বটেই।

সেই সময়ে এক লাইন লিখে একশো টাকা পাওয়া—এবং নিজের লেখার লাইনে নয়—আন্‌কোরা আলাদা গলিতে—ভুলতে পারি কি কখনো? আমার রচনার সম্পাদকদুর্লভ সেই সমাদরে, বলতে কি, ঘিয়ের মতই আমি গলে গিয়েছিলাম সেদিন।

তাই মনে করলাম এই লাইনেও—এই এক আধ লাইনেও তো আমার বেশ আসে। প্রচারসচিবের কাজটা নেবার তবে বাধা কী? লেখার এই নতুন লাইনটাই নিলাম না হয়? লেখকজীবন থেকে একেবারে ডিরেল্‌মেণ্ট তো নয়?

পাঠিয়ে দিলাম আবেদন। শ্রী-ঘৃত-কীর্তির উল্লেখ করতেও দ্বিধা করলাম না।...

চিঠি রওনা করার দিনকয়েক পরেই জবাব এলো। ডাক পড়েছে আমার।

গেলাম মুলাকাৎ দিতে—

'দেখুন আবেদনে জানিয়েছেন যে আপনি একজন লেখক', সুরু করলেন ভদ্রলোক, 'কিন্তু আপনার লেখার কোনোই পরিচয় দেননি। কী লেখেন আপনি? সাইন্‌বোর্ড? মনিঅর্ডার ফরম্‌? না, হিসেবের খাতা?'

'আজ্ঞে না। গল্পটল্প লিখি। বইটই।' সলজ্জভাবে জানালাম।

'কিন্তু মশাই, বই তো নয়, বিজ্ঞাপন লেখার কাজ যে! দায়িত্বপূর্ণ—বেশ শক্ত কাজ।' তিনি বলেন—'আরো অনেক আবেদন এসেছে। সবাই নমুনাস্বরূপ কিছু না কিছু বিজ্ঞাপনের কপি লিখে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার চিঠির সঙ্গে তেমন কিছু তো নেই।'

আপনি কী হারাইতেছেন

ইচ্ছে হোলো যে বলি স্বয়ং কপিকলই এসে যখন হাজির তখন বলুন না, কতো কপি চাই আপনার? কিন্তু ওভাবে না বলে ভাবটাকে ভাষান্তরিত করে দিই—'কপি লিখতে কতোক্ষণ মশাই? লেখাই তো আমাদের পেশা।'

'শ্রীঘৃতের ওটা কি আপনার সত্য ঘটনা?' উনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দেখুন, শ'খানেক আবেদনের সঙ্গে শ'পাঁচেক বিজ্ঞাপনের কপি পেয়েছি। লক্ষ্য করে দেখলাম—অবশ্যি, দেখেছি ওপর ওপর—একটাও ওর সুবিধের নয়। আমি চাই একেবারে অন্যরকমের। নতুন ধরণের এমন কিছু যা সহজেই সবার নজরে পড়বে—লোকের আলোচ্য হয়ে উঠবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।'

কপি লিখতে

'তাইতো হওয়া উচিত। যাতে আপনার বিজ্ঞাপনে সবার চোখ পড়ে—আপনার বালতির ওপর ঝোঁক পড়ে সবার'—বলতে যাই আমি।

আপনি জানেন না !

'গতানুগতিক—যেমন সবাই বিজ্ঞাপন দেয়—তেমনটি আমার চাইনে। আমি চাই নতুন আইডিয়া।'

কতোক্ষণ মশাই ?

'যা বলেছেন। ঐ নতুন আইডিয়ার কথাই আমি বলছিলাম।' আমি বল্লাম—'বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।'

'কিরকম শুনি ?' তিনি শুধান।

সত্যি বলতে, কোনো আইডিয়াই আগের থেকে ঘাড়ে করে আমি যাইনি। আইডিয়াটা তক্ষুনি-তক্ষুনি আমার গজালো, ওঁর কথায়। ওঁর

আপনি কী হারাইতেছেন

এই গজালির মাথায় গেঁজে গজ্‌গজ্‌ করে উঠলো আমার মগজে। জুতোর গজালের মতই খচ্‌খচ্‌ করে উঠলো ঘিলুর পাদপীঠে।

আমাব আইডিয়াগুলো ঐরকমই। আগের থেকে গাদা হয়ে থাকে না, অকারণে এসে গঞ্জনা দেয় না—তাগাদার সময় দবকার মাফিক গজিয়ে ওঠে। মুহূর্তে মুহূর্তে স্ফূর্ত হয়। যখন আসে, বিদ্যুৎ-চমকের মতই আসে, আমার মাথার আকাশ এফোঁড়-ওফোঁড় করে খেলে যায়। চমকিত করে তোলে আমায়—আমার আইডিয়াবা। চমৎকৃত করে, কিন্তু কখন্‌ আসে, কিভাবে আসে, কেন আসে—আমি তার কোনো আইডিয়াই পাই না।

আইডিয়ার বিদ্যুৎবিকাশ

'শুনি আপনার আইডিয়াটা একবার?'

'এইমাত্র আপনি একটা কথা বল্লেন—সত্য ঘটনা।' আমি বল্লাম—'বল্লেন না?'

'হ্যাঁ বলেছি।' তিনি স্বীকার করলেন।

'ঘটনা কাকে বলে?' আমি জিগেস করি।

তাকালেন তিনি আমার দিকে। 'কেন, ঘটনা—যা ঘটেছে তাই তো ঘটনা?' তিনি জানান—'আমি তো তাই জানি মশাই!'

আপনি জানেন না !

'ঠিক তাই।' আমি সায় দিলাম—'তাহলে দেখুন, 'সত্য ঘটনা' কথাটা বিল্‌কুল্‌ ভুল। সম্পূর্ণ অশুদ্ধ বাঙলা। ঘটনা মানেই তো সত্য, তার ওপরে আরো সত্য চাপানো অনাবশ্যক। নিতান্তই বাহুল্য মাত্র। তাই নয় কি ?'

মানতে হোলো তাঁকে। ঘাড় নাড়লেন তিনি—একটু বিমর্ষ মুখেই।

'তারপরে দেখুন, আপনি বল্লেন যে বিজ্ঞাপনের কপিগুলি আপনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার মানে হচ্ছে মন দিয়ে দেখা। যত্ন নিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখা—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওপর ওপর চোখ বোলানো আর লক্ষ্য করা এক জিনিস নয়।'

তক্ষুনি উঠে তিনি অভিধান পাড়লেন—খোঁজ নিলেন কথাটার। খুঁজে পেতে যখন দেখলেন যে আমার কথাই খাঁটি তখন কে যেন তাঁকে চাঁটি মারলো। মোটেই খুশি দেখা গেল না তাঁকে। কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু উত্তর-দক্ষিণ মাথা নাড়লেন তিনি—রীতিমতন গম্ভীর হয়ে।

'এখন আমার কথা এই, আমরা বাঙালীরা হচ্ছি ভাষাগর্বিত জাত। সবকিছুই আমাদের ভাষা-ভাষা। 'মোদের গরব মোদের আশা—আ—মরি বাঙলা ভাষা!' শুনেচেন নিশ্চয়ই বেতারে? শোনেন নি? মনের সেতারের সঙ্গে সেই সুর গাঁথা আমাদের—' কথাটাকে আমি ভালো করে তারিয়ে নিই চারিয়ে দেবার আগে—'যদি কোনো বাঙালীকে মুখের ওপর বলা হয় তুমি ইতিহাস জানো না, ভূগোল জানো না, বীজগণিত জানো না, প্রত্নতত্ত্ব কি পুরাতত্ত্ব জানা নেই তোমার, তাহলে সে মোটেই কিছু মনে করবে না, মেনে নেবে অম্লানে, কিন্তু যদি তাকে বলি, মশাই আপনি বাঙলা জানেন না অমনি তার মনে গিয়ে লাগবে। সারাদিন মন ভার হয়ে থাকবে তার।.....'

'তা ঠিক।' নিজের মনোভার তিনি মোচন করলেন। বেশ ভারিক্কি ভাবেই।

'এখন, বিজ্ঞাপনের মোদ্দা কথাই হচ্ছে, লোকের মনে লাগানো। যাতে কথাটা ঘুরে-ফিরেই তার মনে আসে, কিছুতেই সে না ভোলে, ভুলতে না পারে। তাই নয় কি? আমার বিজ্ঞাপনের ধারাটা হবে এই ধরণের ভাষার যতো খুঁৎ ধরে'। সারাদিনের কথাবার্তায় সাধারণের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে সেইসব দেখিয়ে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ—' আমি দেখাতে সুরু করি:

'সত্য ঘটনা কথাটা কি ঠিক? না মশাই, আদৌ না। যখন আপনি সত্য ঘটনার কথা তোলেন তখন, বলতে আমি বাধ্য, যারপরনাই ভুল করেন আপনি। ঘটনা, সত্য বলেই তো ঘটনা—তা না হলে তো তা কিছুতেই ঘটনা হতে পারত না। আপনি কি মিথ্যা ঘটনার কথা শুনেছেন কখনো? ইত্যাকারে সুরু করে একজন নামজাদা লেখকের ছবি দেব. আমাদের বিজ্ঞাপনের সাথে—ইনি একজন বড লেখক, তার কারণ এঁর লেখার প্রত্যেকটি কথা সুনির্বাচিত। আপনি যেমন টাকা বাজিযে নেন, ইনি তেমনি প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বাজিয়ে তারপরে তা ব্যবহার করেন। তেমনি আমাদের বালতির বেলাতেও, তা বাজে কিনা, বাজারের আরো দশটা বালতির সঙ্গে বাজিযে দেখে তবে আপনি নেবেন।'

কথাটা ভদ্রলোকের মনে লাগে। প্রাণে বাজে। এতক্ষণে তাঁর মুখের গুমোট কেটে গিয়ে কিছু হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। নাতিক্ষীণ রেখার মতই, তাঁর গোঁফের দুধারে। ভার ভার মুখের মেঘলার ধার ধার রূপালী হয়ে ওঠে।

আপনি জানেন না !

'এ ধরণের বিজ্ঞাপন, দেখবেন, দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়বে দেখতে না দেখতে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে মানুষের মনে মনে। আপনার বালতি কাটবে হু হু করে—বালতি বালতি টাকা ঘরে তুলবেন আপনি।'

'তার এক বালতি আপনার।' তিনি সহাস্যবদনে বর দিলেন আমায়—'বেশ, তাহলে সুরু করে দিন। লেগে যান্ আজ থেকেই।'

দিলাম সুরু করে। তিন মাসের মতন খোরাক তৈরি হয়ে গেল গোড়াতেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। কাজটা শক্ত ছিল না আদপেই। ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বেয়াদপি—ভাষার এতরকমের গল্‌তি বাঙালীর গলা দিয়ে গলে যে—চলতে ফিরতে উঠতে বসতে এত অযথা কথা, অযথার্থ বাক্য আমরা ব্যাভার করি—একটু তালে থাকলেই তার তালিকা মেলে। তেরটা কপি বানিয়ে ফেল্লাম আমাদের ভাষা-তারল্যের—মায় লে-আউট সমেত। তের হপ্তায় তের রকমের ব্যঞ্জনা—হপ্তায় হপ্তায় পালটাবার বিজ্ঞাপন। তের হপ্তার পরে ফিরতি আবার—সেই তেরস্পর্শ পরের পর। পূর্ণগ্রহণের পর পুনর্গ্রহণ !·····সুরু হয়ে গেল সেই সপ্তাহ থেকেই।

বিজ্ঞাপনটা হৈ চৈ তুললো বেরুতে না বেরুতেই—প্রথম দিনেই টের পেলাম। বসে আছি ট্রাম্ গাড়িতে, কানে এলো আমার—একজন বলছে অপরজনকে—

'আমি ভাই জানতুমই না। আশ্চয্যি ! লক্ষ্য করা মানে একটু তাকানো—এক পলক মাত্র—য়্যাদ্দিন এই ভেবেছি ·····'

'আমিও তাই।'

বিজ্ঞাপনটা এদের লক্ষীভূত হয়েছে দেখছি। আরো অনেকে এটা

আপনি কী হারাইতেছেন

লক্ষ্য করেছে নজরে পড়লো আমার। বাড়ি-ফিরতি বাসের একজনকে তো উচ্চকণ্ঠেই সাবাস্ দিতে শোনা গেল। এমন ধারার বিজ্ঞাপন আর কখনো নাকি বেরয়নি আমাদের দেশে। সকলেই বেশ লক্ষ্য-সচেতন হয়ে উঠেচেন একদিনেই—দেখলাম!

পাড়ার রেস্তরাঁয় বসে চায়ের ফাঁকে ওলটাতে গিয়ে চোখে পড়লো আনন্দবাজারের পাতার থেকে লক্ষ্যস্থলটাই উধাও! কে যেন বেমালুম কেটে নিয়ে গেছে।

বিজ্ঞাপনটা তাহলে লক্ষ্যভেদ করেছে, বলতে হবে!

তিন হপ্তায় সারাদেশে সোরগোল পড়ে গেল—সত্যিই! আপিসে যাই আসি—সেখানে ঘণ্টাখানেকের মামলা আমার। প্রতি হপ্তার কপি রওনা করে দেয়া খবরের কাগজে, খবর-কাগজের আপিস থেকে লে-আউটটা কম্পোজ হয়ে এলে তার প্রুফ দেখা, ভুল শুদ্ধ করা, কখনো বা এক আধটু শুধরানো। এই তো কাজ। কর্তার সাথে মুলাকাতের দরকারই হয় না, আছি বেশ।

কিন্তু দরকার হোলো হঠাৎ। চতুর্থ সপ্তাহের গোড়ায় আপিসে গিয়েই টেবিলের ওপরে একটা চিঠি পেলাম—কর্তার স্বাক্ষরিত—সঙ্গে একখানা চেক:

'এতদ্বারা আপনার এক মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া আপনাকে বরখাস্ত করা হইল। আজ হইতে আপনার কাজের আমাদের আর কোনোই প্রয়োজন নাই। ইতি—ভবদীয় ইত্যাদি.....'

এর মানে? গেলাম কর্তার কাছে। ঘরের মধ্যে আমাকে দেখেই না তিনি চোখ পাকালেন। তাঁর দুধারের রগ্ ফুলে উঠলো দেখতে

দেখতে—রগন্বিত হয়ে সারামুখ লাল হয়ে উঠলো কিরকম—রাগান্বিত হয়েও হতে পাবে হয়তো।

'গেটাউট—গেটাউট।' ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক—'ঢের হয়েছে। আপনাকে আমাদের চাইনে।'

বালতি-সম্রাটকে এমন কথা বলতে শুনবো, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।—'এর মানে কী, আমি জানতে চাই।' আমি বলি।

গেটাউট্—গেটাউট্

'এর মানে? এর মানে, আমার অনেক টাকা জলে গেছে, আর নয়। গেটাউট।'

মূলধনী-সুলভ দুঃশোষণী মনোবৃত্তি, বুঝতে আমার দেরি হয় না। আমার প্রচার-কাজের সাহায্যে নিজের সুবিধে করে নিয়ে, যতো রাজ্যের পচা বালতি বাজারে পাচার করে অধুনা টাকার ঝাঁড়িতে বসে—এখন পূর্বপ্রতিশ্রুত এক বালতি টাকা দেবার বেলায় তার বদলে আমার মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়া! তাছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু আমিও কৈফিয়ৎ না দিয়ে নড়বার নই। গেটাউট, কিন্তু কেন গেট্‌আউট? এরকম অকথ্য-ভাষণের সন্ধি-বিচ্ছেদে বাঙলা বৈয়াকরণিক

আপনি কী হারাইতেছেন

নিয়ম-লঙ্ঘনের কথা না হয় নাই তুল্লাম—সেসব 'স্খলন পতন ত্রুটি' না ধরেও, এরূপ অনুচিত-কথনের অর্থ কী? সাদা বাঙলায় সোজাসুজি আমি জানতে চাই।

'আপনাকে আমাদের চাইনে। সাদা কথা। সোজা কথা।'

হায়, আপনি কী হারাতে যাচ্ছেন আপনি জানেন না! বিজ্ঞ লোকের একান্ত আপন যে বিজ্ঞাপন, তার মৌলিক কারুকলাই আপনি হারাতে বসেছেন। সেই সুদুর্লভ বিজ্ঞাপনীপ্রতিভাকেই দূর দূর করে দিচ্ছেন। সপ্রতিভভাবেই বলতে যাই কথাটা—গুচ্ছের কথা হলেও গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি।

'গেটাউট। বাইরে গেট আছে, সেই গেট দিয়ে আউট হয়ে যাও। গেটাউট।'

আমিও যেমন নাছোড়, উনিও তেম্‌নি বান্দা। কথার প্যাঁচে পেছোবার নন। তাঁরও তেমনি আমাকে তাড়ানোর pun-ান্ত প্রয়াস।

কিন্তু হট বল্লেই কি আমি হটবো? সেই ছেলেই কি? চট্ করে কি হটবার? এমন কি, চটবারও নই সহজে। এক বালতি টাকা পাবার আবাল্য স্বপ্ন আমার—তা কি ওঁর এক কথায় জলাঞ্জলি দিয়ে চলে যাবো এখান থেকে? অম্‌নি অম্‌নি?

'কেন, আমার প্রচারকাজে কি কোনোই ফল হয়নি? হাজার হাজার লোকের নজরে পড়েনি আপনার বিজ্ঞাপন? হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ্যগোচর হয়েছে, আমার নিজের স্বচক্ষে দেখা। বলুন—একি সত্য ঘটনা নয়?'

'সত্যিকার এক দুর্ঘটনা, বলছি তো।' তিনি বলেন: 'হাজার হাজার টাকার শ্রাদ্ধ আমার। আমারো পরের স্বচক্ষে দেখা নয়।'

আপনি জানেন না !

'হাজার হাজার বালতি কাটেনি আপনার ? লাখ লাখ টাকার বিক্রি হয়নি আমার বিজ্ঞাপনে ?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। লাখ লাখ টাকার বিক্রি হয়েছে বটে—ঐ বিজ্ঞাপনেই হয়েছে—' তিনি স্বীকার করেন—'কিন্তু—কিন্তু—'

তিনি একটু কিন্তু-কিন্তু হতেই আমি গর্জে উঠি—'তবে—তবে ?'

'হ্যাঁ, হাজার হাজার কেটে যাবার খবর আমি পেয়েছি। এমন কি, পচা ছেঁড়া উইয়ে-খাওয়া একটাও পড়ে নেই আর—তাও ঠিক…'

'হয়েছে তো ? তবে ?' আমার বিজয়োল্লাস দেখা দেয়।—'তবে কী ?'

'তবে বালতি নয়, অভিধান। অভিধান।' শিবের গীতে তিনি অভিধান আনেন। ভানেন।—'বাজারে অভিধানের কাটতি হয়েছে হাজারে হাজারে।……এখন, দয়া করে—গেটাউট।'

সাত

'খোকা ডুগডুগির জন্যে ভারি বায়না ধরেচে—'

'চাইছে তবে দাওনা কিনে!' চিন্তাহরণবাবুর তক্ষুনি তক্ষুনি বায়না দেওয়া।

'কিনে দাও! তুমি তো বলেই খালাস! এদিকে—' খোকার মা বলতে গিয়ে হোঁচোট খেলেন—চিন্তাহরণের দিকে তাকালেন খানিক—'এদিকে বড়োদিনে মামাবাবু আসছেন যে।' তাঁর কপালে চিন্তার রেখারা দেখা দেয়।

'এলেনই বা! আসুন না। এলেন তো কী?' চিন্তাহরণ নিশ্চিন্ত।

'বড়োদিনের কদিনই বা আর? বড়োমামাও আসবেন, আর এদিকে খোকাও ডুগডুগি নিয়ে মাতবে! বাজাতে থাকবে দিনরাত। তার ডুগডুগুনি লেগেই থাকবে সারাক্ষণ·· ···'

'থাকলোই না হয়! তার হয়েছে কী!'

'হয়েছে কী? অবাক্ করলে তুমি! জানো না, বড়োমামাবাবু গোলমাল একদম ভালোবাসেন না? শান্তিপ্রিয় মানুষ তিনি—তার ওপরে তিরিক্ষি মেজাজের—খোকার ওই ডুগডুগাডুগ শুরু হলে কি আর রক্ষে থাকবে?'

'না তাঁর সয়, কানে তালা দিয়ে থাকবেন না হয়।'

'তালা আর কাউকে দিতে হবে না, খোকাই কানে তালা লাগাবে সব্বার।'

'লাগাক্, তা বলে আমাদের খোকা ডুগডুগি চাইছে, আর তা পাবে না, এ হতেই পারে না। ছেলেদের—ছোটবেলার—সব আবদার রাখতে হয়। শিশু-মনের সাধ না মেটালে কী হয় জানো?·····'

আপনি জানেন না !

এই বলে চিন্তাহরণবাবু শিশুকালের অবদমিত বাসনা কিভাবে পরে উদ্দমিত হয়ে পরকালের সমস্তটাই ঝরঝরে করে দেয় উদাহরণসমেত তার সমূহ বিবরণ উদ্ধার করতে লাগেন।

'বুঝলুম গো বুঝলুম। কিন্তু তোমার মামাবাবু কি এসব ব্যাখ্যানা বুঝবেন? সেবার কী কাণ্ড করেছিলেন মনে নেই? আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরতেই না তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—থামো থামো! থামাও তোমার আর্তনাদ। বলি, ও কী হচ্ছে? গান? গান করতে হয়—বাগানে। লোকালয়ের নশ্বর জীব, আমাদের জীবন ক্ষণভঙ্গুর। সামান্য এই চর্মকর্ণে কি ঐ অসামান্য স্বরলহরী সইবে? সয় কখনো? কান্নাকাটি করতে হয় তো যাও, অরণ্যে যাও—সেখানে গিয়ে রোদন করো গে—প্রাণ ভরে'। পশুপক্ষীরা কোথায় গায়? কোন্ জায়গায়? এই বলে কী ধমকটাই না লাগালেন আমায়। কথাগুলো এখনো যেন আমার মর্মে বিঁধে আছে।'

'আমিই কি ভুলেছি? আর, পাশের বাড়ির সেই সেতারের আওয়াজে—'

'সেতার নয়, বেতার। বেতারে তখন সেতার বাজাচ্ছিল। উনি সেতারীকে চড় মারবার লালসায় পাশের বাড়ি গিয়ে চড়াও হয়েছিলেন। হাতে-নাতে শিক্ষা দিতে গিয়ে দ্যাখেন, লোকটা হাতের নাগালের বাইরে। এরকমের শান্তিপ্রিয় মানুষকে নিয়ে কি কম অশান্তি?'

'তা হোক। তা বলে ওঁর জন্যে যে আমাদের ছেলে একটা ডুগডুগি পাবে না, তা হতেই পারে না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি ছেলে! দেবই আমি ডুগডুগি।'

আপনি কী হারাইতেছেন

চিন্তাহরণবাবুর সাফ কথা শেষপর্যন্ত। নিজেব সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে তিনি অটল।

'তুমি তো দিয়েই খালাস! আমাকে সব দিক দেখতে হয়—।' শ্রীমতী সমস্ত খতিয়ে দ্যাখেন—শেষের পরেও যে বিশেষ থাকে সে-পর্যন্ত গিয়ে ক্ষতি কতো দাঁড়াবে—ক্ষত-বিক্ষতি অব্দি গড়াবে কিনা—ভেবে দেখতে হয় তাঁকেই। খোকা ডুগডুগি-চর্চা করুক, আর তাকে নিয়ে তার দাদু আরেক রকমের চড্চা চালান—তাঁর চওড়া হাতের চড়-চাপড় চলুক—গান-বাজনার দিকে থেকে এ ধরণের সঙ্গত্ কতখানি সঙ্গীন, আর কতোদূর যে অসঙ্গত, ভুরু কুঁচকে একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলেই তা চোখে পড়ে।

কিন্তু যতই না তিনি কর্তাটিকে সম্ঝান—কিছুতেই তাঁকে দ্বিমত করানো যায় না। খোকা ডুগডুগি পাবেই—তিনি নিজেই তাকে কিনে এনে দেবেন—বড়োদিনের শুভ দিনেই। খোকার বাবার গোঁ খোকার চেয়ে কিছু কম নয়। হাজার অনুরোধ উপরোধেও—ঢেঁকি ঠিক না হলেও—হাঁ করে যে-ডুগডুগি তিনি গিলেছেন একবার—তাকে আর না করায় কে? ওই গলা দিয়ে ওগ্লায়—কার সাধ্যি?

অবশেষে বড়োমামা আর বড়োদিন দুই এসে হাজির—এক তারিখেই! ডুগডুগির সঙ্গেই।

ডুগডুগি অবশ্যি তার একটু আগেই এসেছিলো। পৌষ মাস আর সর্বনাশ এক সাথেই ঘনালো।

বড়োমামা চৌকাঠে পা দিয়েই বাড়ি মাথায় করলেন—'কই, আমার তেড়েনাম কই? তেড়েনাম?'

আপনি জানেন না !

'তেড়েনাম ? সে আবার কে ?' চিন্তাহরণ সপরিবারে হাঁ করেন।—'তেড়েনাম কী ?'

'তেড়েনাম কী, তাও জানো না ? এতদিন ধরে রেডিয়োয় রামধুন্ শুনলে আর তেড়েনাম জানা নেই ?' মামাবাবু যেন তেড়েই আসেন—'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, পতিত পাবন সীতারাম।'

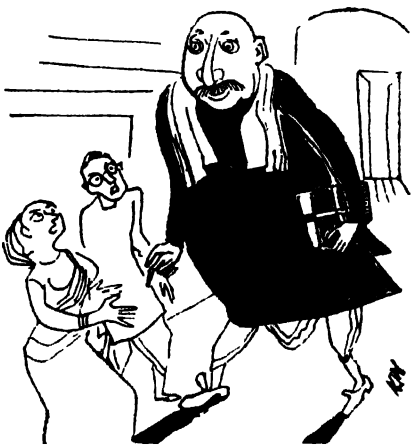

কই আমার তেড়েনাম কোথায় ?

চিন্তাহরণ বোঝেন কি না কে জানে, মুখের হাঁ তাঁর বোজে না।

'কই, আমার তেড়েনাম কোথায় ?' বড়োমামার বেজায় তাড়া। তাকে না দেখে যেন তাঁর স্বস্তি হচ্ছে না।

'তেড়েনাম ! তেড়েনাম……?' ভাগনে বৌয়ের আওয়াজ বেরয়—আম্‌তা-আম্‌তা হয়ে—'তেড়েনাম কে মামাবাবু ?'

'কে আবার ? আমার দাদু। আমার স্বর্গের বাতি—নাতি আমার। আবার কে ?'

'ও খোকা ? খোকন ? তেড়েনাম তো নাম নয় তার মামাবাবু। খোকাই সে এখনো—বছর চারেক হোলো কিন্তু তার কোনো ভালো নাম রাখা হয়নি আজো।'

'রাখা হোক এবার। এই তো বেড়ে নাম—তেড়েনাম। ঈশ্বর আল্লা তেড়েনাম—ভগবানের নাম কি খারাপ ?'

'না, খারাপ কি।' চিন্তাকুল চিন্তাহরণ নিজের চিন্তাজাল থেকে বিচ্ছিন্ন হন। চিন্তার কুল পান।

'আমার পাঁচ ভাগনের ছেলেদের নাম তো আমিই রাখলাম—বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবার। যাদের নামকরণ হয়েছিলো,—তাদেরো নাম পাল্‌টে দিলাম। উল্‌টেপালটে দিতে হোলো। বড়ো ভাগনের ছেলেটির নাম রেখেছি ঈশ্বর, মেজভাগনের একটিমাত্র মেয়ে—আদুরে মেয়ে—তার নাম হয়েছে আল্লা। আল্লা কিন্তু কিছুতেই আল্লা হতে রাজি হচ্ছে না। বিস্তর চকোলেট খাইয়ে তবে তাকে রাজি করিয়েছি। এবার এলাম তোমাদের বাড়ি—তোমাদের পালা এখন। খোকার নাম রইলো তেড়েনাম। বুঝলে ?'

দাদু তাঁর নাতিনাতনীদের সুনাম রটান্—তাড়িতবার্তার মতই দুঃসংবাদগুলি একে একে অবারিত হয়।

'এখন বাকী থাকলো আমার আর দুই ভাগ্‌নে। সান্‌কুর, পান্‌কুর হয়েছে ; চান্‌কুরও হোলো—বাকী রইলো শুধু মান্‌কু আর নান্‌কু।'

'ছোট্‌ঠাকুরপোর তো এই সেদিন মাত্র হোলো'—ভাগ্‌নে-বৌ বলতে যায়।

'হোলোই বা। এখন হলে কি এখনি রাখতে নেই নাম ?' মামাবাবু অবাক হন।

'তাও আবার যমজ।' চিন্তাহরণের খট্‌কা অন্য জায়গায়।—'তার একটা ছেলে একটা আবার মেয়ে।'

সেইজন্যেই তো তারা সীতারাম। একটা সীতা আর একটা রাম।

ভগবান সত্যিই এমন সব মিলিয়ে রাখেন ! রাখতে পারেন ! ভাবলে অবাক হতে হয়। যেন আমাদের বোম্বাই।'

'বোম্বাই—সে আবার কী ?' তেড়েনামের মা যেন আরেক ধাক্কা খান। তাকান মামার মুখে। তাঁর এই নতুন বাই—নাম করার বাইটাই তো বোম্-এর মতন—এর ওপরেও রোমাঞ্চকর আরো কিছু আছে নাকি ফের ?

'বোম্বাই, মানে, খালি মিল্ আর মিল্। যেন রবিঠাকুরের কবিতা গো।' মামাবাবু জানালেন : 'ভগবানের এই রাজ্যে কি কোথাও এতটুকু গরমিল হবার যো আছে ?'

গরমিলের কথায় গিন্নির গোঁজামিলের কথা মনে পড়ে—ডুগডুগির কথাটা। তার গঞ্জনা থেকে এই মিলনপর্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি আগে-ভাগেই অবহিত হন। আস্তে আস্তে ভাঙতে যান।

'তেড়েনামের জন্যে কী এনেছেন মামাবাবু ? ঝুমঝুমি টুমঝুমি—কিছু ?'

'ঝুম্ঝুমি ? ঝুম্ঝুমি তো বাজে। ছেলেদের হাতে কি বাজে জিনিস দিতে আছে ?' মামাবাবুর ভুরু কুঁচকায়।

'শিশুরা তো বাজনাই ভালোবাসে মামাবাবু !' চিন্তাহরণেরও চিন্তা-সূত্রপাত।

'খোকার—মানে, আপনার তেড়েনামের ডুগডুগির কিন্তু ভারী সখ। দিন্ না মামাবাবু তাকে একটা ডুগডুগি কিনে।' খোকার মায়ের আবদার।—'এবারের বড়োদিনে ?'

'উহুঁ। বাচ্চাদের এমন জিনিস দিতে হবে যা বাজে না। আজে বাজে না। যেমন ধরো বই। কিন্তু বাজে বই নয়।'

আপনি কী হারাইতেছেন

'বই ! বইয়ের খোকা বুঝবে কি ! হাতেখড়িই হয়নি এখনো।'

'না হোক হাতেখড়ি, তাতে কি ? বই নিয়ে ছিঁড়ুক খুঁড়ুক—সেও ভালো।'

'বই কি খোঁড়া যায় ?' চিন্তাহরণের একটি অচিন্তিত প্রশ্ন। কূট এবং কটু।

কিন্তু খোঁড়ামির সে-লেম্-এস্‌কিউজ্ কানেই তোলেন না মামা—

'ছিঁড়লেই তো বই মাটি। মাটি তো খোঁড়া যায় ? খুঁড়ুক না তখন !'

কিন্তু বেশি খুঁড়তে হোলো না, ক্ষুরধার ডুগডুগিনাদ ভেসে এলো অদূর থেকে। হাতেখড়ি না হলেও খোকার হাতে খাঁড়া যে হয়েছে তার খবর পাওয়া গেল—বলতে না বলতেই। ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ—সাড়া পড়ে গেল সারা বাড়িতে। মামাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন—

কানে হাত দিয়ে বসে পড়লেন কেদারায়—'কী সবনাশ ! কী সর্বনাশ। কী সর্বনাশ।'

চিন্তাহরণ মনে মনে খুসীই হন। ডুগডুগির আওয়াজ তাঁর কানে যেন মধু ঢেলে দেয়। খোকা যদি সমানে এই রণ-বাদ্য বাজিয়ে যেতে পারে তাহলে হয়ত এযাত্রা অতি সহজেই মামাত ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। এক্ষুনি হয়ত মামাবাবু ঐ ডুগডুগির তাড়নায় রেগেমেগে এই পাপপুরীর ত্রিসীমানা ত্যাগ করে তড়িদ্বেগে বেরিয়ে পড়বেন—এই অভাগা চান্‌কুকে চিরকালের মতই ত্যজ্য ভাগনে করে তার স্নেহের মান্‌কু-নান্‌কুর অভিযানে। পতিতপাবন (একক) আর সীতারাম (যুগপৎ)-এর অতিজরুরি নামকরণের তাগাদায় মানভূম আর সাঁওতাল পরগণার দিকে তাঁর হামলা সুরু হবে। মামলা মিটে যাবে সহজেই।

আপনি জানেন না !

ফুর্তির আতিশয্যে তিনি বাথরুমে চলে গেলেন। সেখানে বসেই ডগমগ হয়ে শুনতে লাগলেন ডুগডুগি। ডাগ ডুগা ডুগ—বেড়ে বেড়ে ক্রমেই আরো বেড়ে হয়—বেশ ডাগুর ডুগুর হয়ে ওঠে। পরম পরা-ক্রমেই! আহা, কী মিষ্টি—কী সুমধুর ধ্বনি—এই ডাগডুগা—ডুগ! শুনতে শুনতে অশ্রু স্বেদ পুলক রোমাঞ্চ ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ বাহ্য দশাতেই তাঁর দেখা দেয়। তেড়েনামের হাতে পড়ে ডুগডুগির ডুগ-ডুগুনিও তেড়ে ফুঁড়ে উঠতে থাকে সমান তালে—সটানে—উদারা—মুদারা—তারায়। তারপর চূড়ায় উঠে তাড়াতাড়ি থেমে যায় হঠাৎ। চুপ! সব চুপ একেবারে।

অ্যাঁ? এ কী? অভাবে বিভোর হয়ে অর্ধবাহ্য-দশায় বেরুলেন তিনি বাথরুম থেকে। ব্যাপার কি? চিন্তাহরণকে একটু চিন্তিত হয়েই বেরুতে হোলো—বলতে কি!

বেরিয়ে দেখলেন মামাবাবু সেরা ডেক্ চেয়ারটিতে ডেরা নিয়েছেন। নিয়ে সকালের কাগজটিকে চোখের সামনে মেলে ধরেছেন। কাগজের ফাঁক দিয়ে যতোদূর দেখা যায়, তাঁর মুখে আরামবাগের ছবি,—যে-আরাম কদাচিৎ মানুষের বাগে আসে! মানভূমের টিকিট কাটবার কোনো লক্ষণ সেখানে নেই। এই মানচিত্র দেখবার পর ভূগোলের অন্যদিকে তাঁকে ছুটতে হোলো—অকস্মাৎ না-গোলের কারণ জানতেই।

গিয়ে ছাখেন খোকা পা ছড়িয়ে বসেছে ভুঁয়ে—ডুগডুগিটাকে বাগিয়ে ধরেছে দুপায়ের সমাসে। তার হাতে ছোট্ট একটা ছুরি—চকচকে আর ধারালো। তাই দিয়ে ডুগডুগিটাকে কেটেকুটে শেষ করেছে সে—কিছুই তার বাকী রাখেনি আর।

'এই। কোথায় পেলি এই ছুরি?' তিনি গর্জে উঠলেন।

'তোমার নয়।' বল্ল খোকা। 'দাদু দিয়েছে আমায়।'

এই কোথায় পেলি এই ছুরি? গর্জে উঠলেন তিনি।

'কী হচ্ছে ঐ শুনি? আঁ? ছুরি দিয়ে ডুগডুগিটাকে—' ছুরিটার সবখানি ধার আব সমস্ত চাকচিক্য যেন তাঁর মুখে-চোখে খেলতে থাকে। তাই দিয়ে ছেলেটাব সমস্ত ছলাকলা যেন তিনি ফলাফলা করতে চান।

'ফাঁক করে দেখছি আমি কোথায় সেই দুষ্টু ছেলেটা।' খোকা

জানালো একটুও দ্বিধা না করে—'যে-দুষ্টু ছেলেটা তোমার এই ডুগডুগির মধ্যে ঢুকে যতো গোলমাল করছে, একটা দুষ্টু খোকা বুঝলে বাবা? আমি সেই দুষ্টুটাকে ধরবো, কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে, খুঁজেই পাচ্ছি না।' খোকা ডুগডুগির ফাঁকে-ফোঁকরে উঁকি মারে।

ছোড়া ও ছবি!

'দুষ্টু ছেলে? দুষ্টু ছেলে বসে আছে ডুগডুগির মধ্যে—কে বল্লে তোমায়?' চিন্তাহরণ ফেটে পড়েন। প্রায় তাঁর সদ্য-বিস্ফাটিত অন্ধকার উপহারটির মতই।

'বারে! দাদুই বল্লো তো—' জবাব দিলো খোকা অম্লানবদনেই।

আট

প্রৌঢ় লোকরাও কখনো কখনো প্রেমে পড়ে। পড়ো পড়ো হয়…

উনপঞ্চাশ পেরুবার পর যখন আর চার আসে না জীবনে, ৫০ আসে, ৬০ আসে (শত্তুর-মুখে ছাই দিয়ে সত্তরও আসতে পারে) কিন্তু হায়, চার-ইয়ারি চলে যায় তারপর—জীবনের মতই। গোড়ার সে-চার আর থাকে না। তারপরে সাত পাঁচ যাই আসুক না,—শূন্যই খালি চোখে ভাসে। অবশ্যি. চল্লিশ পার হবার পর—তেতাল্লিশ পেরিয়ে —বেচারার জীবনে ডবোল্ চার দেখা দেয় বটে—শেষবারের মতই— নেভার আগে প্রদীপ যেমন দ্বিগুণ জ্বলে। বাঁচার নতুন একটা চার দেখা যায় তখন—চুয়াল্লিশে পৌঁছে…

কিন্তু ৪৪ নয়, পঞ্চাশ পেরিয়ে হৃষীকেশবাবু প্রেমে পড়লেন…

যে বয়সে মানুষ বার পঞ্চাশেক প্রেমে পড়ে—এতদিন ধরে' উঠে পড়ে প্রেম করার পর সবার কাছে পরাস্ত হয়ে শেষ অব্দি ধুত্তোর বলে' প্রেম থেকে উঠে পড়ে—তখনই হৃষীকেশবাবুর প্রেমপর্ব এলো। প্রথম প্রেমে পড়লেন। যখন নাকি হৃদয়ে চড়া পড়ে—তখনি তাঁর প্রেমের চারা গজালো সব প্রথম। তিতবিরক্তিতে জীবনতরুর শাখা প্রশাখা যখন নাকি শুকিয়ে যাবার কথা, তখনি তাঁর শুক্‌নো নিমডালে নতুন পাতা দেখা দিলো—নবপল্লবের।

ঋষিতুল্য আমাদের হৃষীকেশবাবু! এতদিন তিনি পরলোকের কাজেই কাল কাটিয়েছেন, ইহলোকের দিকে তাকান নি। ফুরসৎ পাননি তাকাবার। তাছাড়া, ধর্মকর্মেও তাঁর মতি ছিল, পরলোকের ভয়ও

ছিলো মনে (পর্‌তা প্রেমিক বেপাড়ায় পেলে পরে বেপরোয়া ধরে ঠ্যাঙায়, পরলোকদের এই বড়ো দোষ !) এইসব কারণেই ভুল করেও তিনি পরিলোকের দিকে নজর দেননি কোনোদিন।

এখন, পঞ্চাশের কূল পেরিয়ে—প্রায় ষাটের কোল ঘেঁষে অনঙ্গের সাথে তাঁর কোলাকুলি হোলো। খোঁচা খেলেন তিনি পঞ্চশরের। বুকের কাছটা খচ্‌ খচ্‌ করে উঠতেই তিনি ফিরে তাকালেন—ইহ-লোকের পানে। অভাবনীয়ভাবের এই হঠকারিতা—অতি হঠাৎ ! ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন ফের···

আবার—আবার তাঁদের সেই চার চক্ষের মিলন ! আর, চার চক্ষের মিলনে নাচার হয় না এমন নাবালক নাবৃদ্ধ বসুন্ধরায় কে আছে ? ব্যস্‌, আর দেখতে হোলো না, প্রেমে পড়লেন হৃষীকেশবাবু।

ইহলোক-পরলোক সব ভুলে প্রেমে পড়ে গেলেন। যমালয় আর পরিণামের কথা বিল্‌কুল বিস্মৃত হয়েই অকূলের দিকে পাড়ি জমালেন !

এগিয়ে গেলেন তিনি মেয়েটির কাছে···

এঁড়ে বাছুরটিকে কলতলায় এনে গা ধোয়াচ্ছিল মেয়েটা। আহা, কী হাসিখুসি মেয়ে আর কেমন পুরুষ্টু বাছুর ! পরিষ্কার বাচ্ছাটা—মেয়েটির মতই ধবধবে। আর বৎসটি যেমন পুষ্ট তেম্নি হৃষ্ট সেই শ্রীমতী। দুজনে মিলে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট।

অবশ্যি, মেয়েটি নেহাৎ বাচ্চা নয়, বছর বিশেক হবে। বিশ-দৃশ সুন্দরীর কাছে এক আধবুড়োর প্রেম-নিবেদন—একটু কেমন বিসদৃশই না ? কিন্তু বয়সের বিশ সাপের বিষের চেয়ে বেশি মারাত্মক। তার ছোবল যার লাগে তার কি কোনো হুঁস থাকে ? তাকে বিশ্বাস

নেই, সে সবকিছু করতে পারে। তাকে হুঁশিয়ার করা যায় না। বনে যাবার বয়সে সে যৌবনে ফিরে যেতে চায়।

আস্‌নাই জিনিসটাই এম্‌নি। আশা নাই একথা সে ভাবতেই দেয় না। সানাইয়ের বাজনা শোনায় অত্যন্ত অসময়েও···

'শ্রীবৎস চিন্তা'

জীবনের ষষ্ঠীতে এসে অকালবোধন হোলো হৃষীকেশবাবুর। ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হবার সাধ জাগলো বুঝি বা···

মেয়েটির কাছে তিনি এগিয়ে গেলেন···

'আহা, কী সুন্দর—কী মধুর !' কথা পাড়লেন গিয়ে : 'এমন অপরূপ আমি জীবনে দেখি নি…'

চার চক্ষের মিলনে নাচার

মেয়েটি এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো। মাধুর্যের ভারেই, মনে হয়।

'মানে, তোমার এই গরুটার কথাই বলছিলাম,' আমতা আমতা করেন হৃষীকেশ। কি জানি যদি কিছু মনে করে বসে মেয়েটি, তাই কথাটা গোরুতর কিছু নয় বলে তিনি উড়িয়ে দিতে চান। গোড়ার আলাপেই বেশি আগানো ঠিক কি ?

'হ্যাঁ, বুধনের ভারী বুদ্ধি।' ঘাড় নাড়ে মেয়েটি। ঘাড়ের সাথে সাথে চুলগুলি তার নড়ে। আর, এমন চমৎকার দেখায়। আন্দোলন তোলে বুঝি হৃষীকেশের মনেও।

না, বুধন নয়—তুমি ! তুমিই আমায় উদ্বুদ্ধ করেচো। এই কথাটাই বলতে চায় হৃষীকেশ। তুমিই আমার নব-উদ্বোধন। খোলসা করেই সে বলতে যায়, কিন্তু কথাগুলি যখন গলার খোলস ছাড়ে—'সত্যি, এত সুন্দর—এমন

সুন্দর কখনো দেখি নি আমার জীবনে। কী মিষ্টি—কী সুমধুর।' হয়ে ওঠে।

মেয়েটি মুখ নীচু করে' থাকে। ভারবাচ্যে বলা কথাগুলির বাচ্য ভাব হজম করার চেষ্টা করে বোধ হয়।

'এই—এই একটি জিনিসই পাই নি আমার জীবনে—' বলতে গিয়ে নিঃশ্বাস পড়ে হৃষীকেশের—'হায়, জীবনটা আমার বৃথাই গেল।'

তিনি হায় হায় করেন।

'পেতে চান্ নি হয়তো—সেইজন্যেই।' মেয়েটি একটু মৃদু হেসে বলে। কথাগুলি শোনায় যেন গুঞ্জনের মতই। গঞ্জনার মত নয়কো যেন।

শুনে বুঝি হৃষীকেশের খট্‌কা লাগে। খট করে লাগে ওর মনে। মেয়েটি···মেয়েটি কি তবে··? য়্যাঁ, মেয়েটিও? হাতুড়ি পিটতে থাকে ওর বুকে।

'আর এখন···এই বয়সে· এখন কি আমার কোনো আশা আছে? পাবার আশা কি রয়েছে আর?' হৃষীকেশ একটু কেশে নেয়।

'চেষ্টা করে' দেখতে দোষ কি?' মেয়েটি বলে হেসে হেসেই।—'বেয়ে চেয়ে দেখতে পারেন।'

'চেষ্টা করতে বলো তুমি?'

'আপনি আমার বাবাকে বলুন।' এই কথা বলে মুচ্‌কি হেসে বাছুর নিয়ে চলে যায় মেয়ে।

কয়েকটা গাই নিয়ে ওদের খাটাল্—পাশের বস্তিতেই। খাটাল্ বলে তা কিছু খাটো নয়, বস্তি হলেও তা এখন শ্রাবস্তিই—হৃষীকেশের

কাছে অন্তত। স্বর্গের আভা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জায়গাটাই কেমন সুষমাময় হয়ে উঠেছে। গোবরের গন্ধে সুরভিত এক গন্ধর্বলোক !

দুধে জল মিশিয়ে বনমালীর পয়সা। চারেক্কে চার—চারের কারবার তারও। দুয়ে দুয়েই চার। গরু দুয়ে যে দুধ, তার এক সেরে তিন সের জল মিশিয়েই তার চার ফেলা—আর সেই চারে খদ্দের আসে। এসে ধরা পড়ে তার খাটালে।

পণপ্রথার কামড় !

পরদিন সকালে হৃষীকেশ এলো। এসে কথা পাড়তেই—

'হ্যাঁ, মেয়ে আমার বলেছে।' বল্ল বনমালী—

'কিন্তু দুশো টাকা দিতে হবে আপনাকে। তার কমে হবে না।'

না, খাঁই তার বেশি নয়, সে অল্পকথার মানুষ।

'রাজি আমি।' জানালেন হৃষীকেশবাবু।—'এক্ষুনি রাজি। তাহলে পাকা কথা হয়ে গেল তো আমাদের ?'

'কথা আমার পাক্কা।'

বাড়ি গিয়ে তক্ষুনি ফেরৎ এলো হৃষীকেশ—বেয়ারিং চিঠির মতই। পণের টাকা তুলে দিলো বনমালীর হাতে।

পণরক্ষা

নোটগুলি গুণে গুণে নিলো বনমালী—উল্‌টে পাল্‌টে দেখে নিলো—তারপরে বল্লে—'বেশ, এবার নিয়ে যান আপনার জিনিস।'

কথার পাকে জড়িয়ে যখন মালিক হয়েছে, তখন আর ছাড়ান্ কী? পরিনা হলে ও—পরিত্রাণ কোথায়? পণ দিয়ে আপন করা জিনিস! দুশো টাকা দিয়ে এঁড়ে বাছুরটিকে নিয়ে ফিরতে হোলো হৃষীকেশকে।

কানাই গিয়ে থামের আড়ালে দাঁড়ালো। ত্রিবিক্রমের বিক্রমটা একবার দেখবে

দেখলো তার ছিপ্‌ছিপে ভাগ্‌নেটি ছিপ নিয়ে পড়েছে। শাঁসালো এক খদ্দেরকে ধরেছে ছিপ দিয়ে।

ছিপখানা কাউণ্টারের ওপরে ধরা।

ত্রিবিক্রম বলছে—'বঁড়শি?'

'হ্যাঁ, বড়শিও চাই বইকি, তাও একটা দিন।'

'একটা? একটায় কী হবে? যদি তেমন তেমন মাছ পড়ে, আপনার বঁড়শি গিলে সরে পড়বে, সুতোটুতো ছিঁড়ে নিয়ে স্টকান দেবে সটান—তখন আপনার সারা দিনটাই মাটি। তার চেয়ে বরং পুরো এক বাক্স নিন্। পাঁচ টাকা মোটে দাম।'

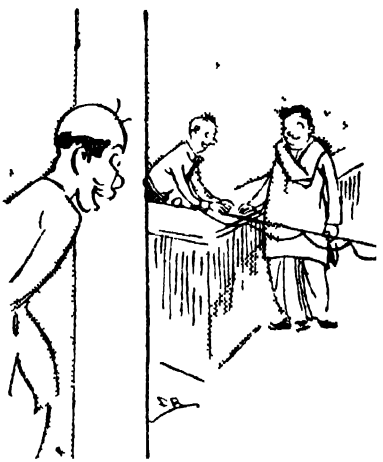

স্তম্ভিত কানাই

বঁড়শির বাক্সটা ছিপের পাশে এসে বসলো।

ভাগনে অনেকদিন ধরেই সাধছিলো দোকানের ভাগ নেবার জন্যে। বখরার ভাগ নয়, দায়ভাগ। অন্ততঃ একটা বিভাগের কেনাবেচার দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দেয়া হোক্। এত বড়ো স্টোরটাকে শাসিত অবস্থা

থেকে সোজা করে তুলতে পারে কি না! দেখা যাক্ এই অচলকে চালু করতে পারে কি না সে।

আমল দেযনি রামকানাই। জন্ম থেকেই তো দেখছে ভাগনেকে। কোনো কাজের নয়, ওস্তাদ্ খালি কথাব। কাজে জড, বচনে দড়। কিন্তু ফাঁকা কথায—কথার ফাঁকিতে কি কোনো কাজ হয়?

অবশ্যি, ত্রিবিক্রম বলে, বেচনদাবিব আগে বচনদাবি। ছ্যাখোই না আমায় দিযে একবারটি।

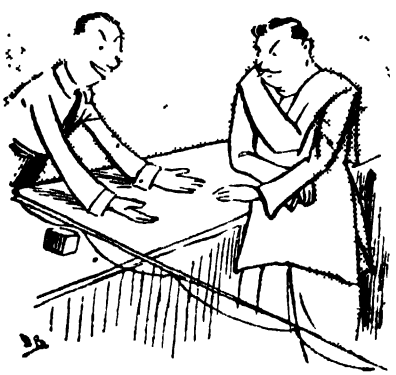

মৎসপুরাণ

অগত্যা, নেহাৎ দায়ে পড়ে, স্পোর্টস্-এর বিভাগটা ছেড়ে দিযেছে ভাগনের হাতে। ছেলেরা তো কথায় ভোলে। আর, এই সব ছেলেরাই পরে খেলোযাড হয়। হবু-খেলোয়াড়দেব কাবু করতে পারে কি না সে—পরীক্ষা কবে দেখাই যাক্ না আগে।

'এখন মাছ ধরবেন কোথায শুনি?' খদ্দেরকে শুধাচ্ছে ভাগনে, কান পেতে শোনে কানাই—'গোলদিঘিতে—হেদোয়? না, কলকাতার বাইরে কোনো পুকুরে?'

সত্যি, খেলোযাড় বটে ত্রিবিক্রম। খেল দেখিয়েছে বটে এই ক'দিনেই! ভেল্‌কির মতই, যাকে বলে! খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম

হু হু করে বেচছে। তার বিভাগের বিক্রি বেড়েই চলেছে ক্রমে ক্রমে। দু হপ্তায় প্রায় তিন গুণ দাঁড়িয়েছে। তাই তিনিও এসে দাঁড়িয়েছেন তার ত্রিসীমায়। এই ত্রি-বিক্রয়ের রহস্যটা কী, ত্রিবিক্রমের বিক্রমটা কিসে, তাই দেখবেন আজ আড়াল থেকে।

ত্রিবিক্রমের কথায় ঘাড় নাড়লো খদ্দের।

'না। আমাদের দেশে। খালে। বাড়ীর পাশেই খাল। পদ্মার থেকে খুব বেশী দূরে নয়।'

'কত বড়ো খাল ?'

'তা, মাইল পাঁচেক লম্বা তো বটেই। চওড়ায়ও অনেকটা।' ভদ্রলোক নিজেব আন্দাজ জানান।

'খালেব ধারে বসে থাকলে কি মাছ আসবে ?' ত্রিবিক্রমের সংশয় জাগে।

'ধারে কেন, চলে যাবো মাঝামাঝি। ডিঙ্গি করে'। গাঁয়ের এক-জনের ডিঙ্গি আছে একটা। ভাড়ায় মেলে।'

'একটাই ডিঙ্গি মোটে ? মনে করুন, আপনার দরকারের সময় সেটা পেলেন না। কি, আর কেউ ভাড়া নিলো, তখন ? ওর প্রতিকার ? তা আছে বইকি আমাদের কাছে। তা হচ্ছে রবারের ডিঙ্গি। আহেল বিলিতি আমদানী। কলাপসিব্‌ল্—ব্যাগের মতন মুড়ে রাখা চলে। মোটরে করে নিয়ে যান যেখানে খুশি। তারপর যখন দরকার, পাম্প করে হাওয়া পুরে নিন্—দেখতে না দেখতে চৌকস একখান নৌকো। নিজেই পাম্প করতে পারবেন—ফুটবল-সাইকেল যেভাবে পাম্প করে ঠিক সেই ভাবে। ডিঙ্গির মধ্যে খাবার দাবার রাখার ব্যবস্থাও আছে, খোপ আছে জিনিসপত্র রাখবার। দুটো দাঁড়। ঠিক যেমনটি আপনার

দরকার। চমৎকাব জিনিস। দেডশো টাকা দাম মাত্র। কাজেব তুলনায় ঢের সস্তাই বলতে হবে।'

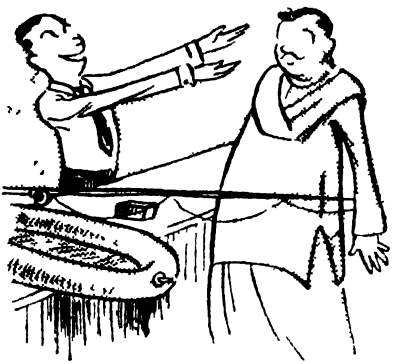

খদ্দেবকে ডিঙি মারা

কথাটা ডিঙিয়ে যেতে পাবলো না খদ্দেব—বাজি হতে হোলো তাকে। ছিপ আব বঁডশির পাশে ববাবেব নৌকো এসে হাজির হোলো।

হ্যাঁ, বেচনদাব বলে একেই। মানতে হয রাম-কানাইকে। কিনবে কেনো, না কিনবে না কেনো—দোকানদাবেব ভাবখানা এমনধারা হোলে তাকে কখনো সেল্‌সম্যান বলে না। সে হচ্ছে শেল্‌-সমান, খালি খদ্দেবেব পক্ষে নয়, দোকানেব পক্ষেও। রামকানাই নিজেব মনে ঘাড নাডে। ভাগনের বচনগুলি নিজেব মনে কবেই সে আওডায—নিজেব অগোচরেই।

ববং, কিনবো কেন? এই প্রশ্ন মনে ওঠার আগেই যে কেনাতে পারে—খদ্দেরের আত্মজিজ্ঞাসা জাগার আগেই যে তাকে বাগায় সেই তো সত্যিকারের বেচনদাব। কিনতে এসে কিন্তু-কিন্তু করছে এমন খদ্দেরও যার কিনারায় এলে পালাতে পাবে না, কোণঠাসা হয়ে কিনে বসে—

যেমন এখন কায়দায় এসেছে এই রাঘব বোযালটি। হাঁ করে' গিলছে ত্রিবিক্রমের কথাগুলো। কথা তো নয় টোপ!

আপনি জানেন না !

'কত লম্বা বল্লেন খালটা ? মাইল পাঁচেক ? পাঁচ মাইল উজিয়ে গেলে পদ্মায় গিয়ে পড়া যায় ? উজানের মুখে পাঁচ মাইল দাঁড় টেনে যাওয়া কি সোজা কথা মশাই ? আর দাঁড় টেনেই যদি থকে যাবেন তো—তাহ'লে মাছ ধরবেন কিসের তাগদে—কোন্ তাগিদে ? অতক্ষণ দাঁড়িয়ে—না না, বসে বসেই দাঁড় টানার কথা বলছি—কিন্তু তাহলেও, বসেই দাঁড়ান আর দাঁড়িয়েই যান, অতক্ষণ ধরে দাঁড়া-লে আপনার দাঁড়ায় ব্যথা হবে না ? তখন কি আর মাছ ধরার উৎসাহ থাকবে তারপর ? যদি আমার কথা শোনেন, তাহলে বলি, এই রবারের ডিঙ্গির সঙ্গে একটা গা-লাগা মোটর জুড়ে নিন। নৌকোটাকে ফাঁপিয়ে তুললেই ওর পেছনের দিকটায় একটা কাঠের হাল আপনার নজরে পড়বে, তার সঙ্গে মোটর লাগানোর জুত আছে। লাগানো একটুও কঠিন নয়, আপনি নিজেই পারবেন। তাহলে ভেবে দেখুন সুবিধে কত। বোটে কাত হয়ে আপনি আরাম করুন, অকারণ দাঁড় টেনে আপনাকে কাতর হতে হবে না। নৌকো ছুটবে নিজের মোটরের জোরেই—ঝড়বৃষ্টির কোনো তোয়াক্কা না করেই। তাহলে খালি কেবল খালে কেন, পদ্মার বুকে গিয়েও মাছ ধরতে পারবেন—যখন খুশি। দাম ? দাম এমন কিছু বেশি না। সাড়ে ছশো টাকা মাত্তর। কোনো হাঙ্গামা নেই, কি করে ফিট করতে হয় আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাহাদুর ! বাহাদুর বাবা ! সাধুবাদ দেন রামকানাই। মামা কানাই মনে মনে গুণগান করেন ভাগনের। এতক্ষণে তাঁর আশা হয় যে দোকানটা সত্যিই এবার জাঁকিয়ে উঠবে—দোকানের সমস্ত দায়ভাগ যদি ওর হাতে ছেড়ে দেয়া যায়। সবখানি দায়, সবগুলি ভাগ।

দেশ স্বাধীন হতেই সাধ করে সাহেবদের এই বড়ো দোকানটা

কিনেছিল কানাই। বিরাট সেলিং স্টোর। হবেকবকম মালের মেলা-ই যেন। সেই সঙ্গে ছক-মেলানো মেলাই কোম্পানীর এজেন্সী—আরো অনেক আড়তেব যোগাযোগ—নানান মালের যোগানদাবি। লাখ লাখ টাকার কাববার। স্বদেশে ফেবাব হিড়িকে সস্তায় ছেড়ে গেছে সাহেববা।

দেশ-বিভাগেব ঝামেলায় কাঁচা টাকার বদলে পাকা ব্যবসা ফেঁদে বসলো সে। চৌবঙ্গির বঙ্গস্থলে পাকাপাকি রকম। কিন্তু এই দেড় বছবের দুর্ভাবনাতেই তাব চুলে পাক ধরবার উপক্রম হয়েছে!

ডিঙির থেকে ডাঙায় তোলা

কিন্তু এখন তার মনে হয়, বিপাক কাটলো বুঝি। চুলের পাকামি আব থামানো না গেলেও, ব্যবসার পাকা ঘুঁটি যে কাঁচতে বসেছিলো সেটা বোধ হয় ঠেকানো যাবে এইবার।

গা-লাগানো মোটরটাকে মাটিতে এনে রাখা হোলো—সত্তকেনা আর সব মালের সামনে।

'ব্যস্, এই আপনার মাছ ধরার সব সবঞ্জাম কম্‌প্লিট্। এই হলেই আপনাব হবে। এগুলি আপনার বাড়িতে আমবা পাঠিয়ে দেব, না…?'

'আমার গাড়ি আছে বাইরে। পেছনের সীটে ধবিয়ে নেব'খন।'

'কী গাড়ি জানতে পারি?' ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসু হয়: 'খুব দামী গাড়ি? কোন্ মেকারের?'

আপনি জানেন না !

খদ্দের গাড়ির নাম আর দাম বলে।

'না, আপনাকে কিছুতেই তা আমি করতে দেব না। দামী গাড়ির সঙ্গে এমন খারাপ ব্যাভার আপনি করতে পারেন না। এই সব মালপত্র বোঝাই করতে গিয়ে নতুন গাড়ির গায়ে চোট খাবে, আঁচড় লাগবে পালিশে। গাড়ির ভেতরের কারুকাজ জখম হবে, গদিও নষ্ট হতে পারে। এ সবের জন্যে আলাদা জিনিস আছে। ঠিক তেমন একটি জিনিসই আপনাকে আমি দেব। তা হচ্ছে ট্রেলার। স্টীমারের যেমন গাধা বোট থাকে, তেমনি একটা,—কী বলবো? গাধা গাড়িও বলতে পারেন। ভারবাহী জন্তু নয়—যন্ত্র। মাল বহনের উপযোগী। জিনিসপত্র তুলে আপনার মোটরের পেছনে শেকল দিয়ে এঁটে দিন—ব্যস্, তাহলেই হোলো—কোনোই আর ঝঞ্ঝাট নেই! যত খুশি মাল চাপান, যেখানে খুশি নিয়ে যান। মাছ ধরতে যান, কি, বাড়ি-শুদ্ধ সবাই মিলে পিকনিক করতেই যান কোথাও। এমন সঙ্গী আর হয় না। গোটা বাড়িটাকেই যেন চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় গাড়িতে। হিল্লি-দিল্লী—যেখানে ইচ্ছে লম্বা লম্বা পাড়ি জমাতে হলে আপনার মোটরের পেছনে যদি এমন একখানা ট্রেলার লাগানো থাকে তাহলে আর কোনো দুর্ভাবনাই নেই। দামও এমন বেশি কিছু নয়, হাজার দেড়েক টাকা মাত্তর। কিন্তু এমন কাজ দেবে, এত উপকারে আসবে আপনার—যে ভেবে দেখলে এ টাকাটা খরচা বলেই মনে হবে না। না, ট্রেলারটা এখানে, আমাদের স্টোরে মিলবে না, তবে আমরা ওর এজেন্ট। দাঁড়ান একটু, এক্ষুনি আমি ফোন করে' আনিয়ে দিচ্ছি—এসে পড়বে এক মিনিটেই। এই কাছেই ওদের আড়ত।'

তাক লাগে কানাইয়ের। তাকিয়ে ত্যাখেন হাঁ করে'। হাঁ, বিক্রি-

পাটার ব্যাপারে ভেল আছে, ভ্যাজাল আছে, কিন্তু ভেল্‌কিও বুঝি কম না। চোখের সামনে ভানুমতীর সেই খেলাই তিনি ছাখেন।

কথায় বলে, কেনা-কাটার ব্যাপার! কাট্‌তে কাট্‌তে কেনো। এগোও দর ছাটতে-ছাঁটতেই। আর, বেচতে বেচতে কাটাও। খদ্দের আর দোকানীতে এই কাটাকাটির কারবার।

কেনারাম আর বেচারামে চিরকালের এই মারামারি। কিন্তু সত্যি-কারের বেচারাম হচ্ছে সে-ই, যে খদ্দেরকে জখম না করেই জখ মারতে পারে। এমন করে' কাটে যে কাটা পড়েও বেচারা টের পায় না, আঁচড়টিও যেন গায়ে লাগে না তার—ঘায়েল হয়েও উল্‌টে যেন আরাম পায় আরো—এমন যে আরামদায়ক—তাকেই বলে বেচারাম। ভাগনের আরেকটি প্রবচন আওড়ান্ মামা আপন মনেই। আর কেনারামরা এহেন বেচারামের চিরকালের কেনা। তাদের পাল্লায় পড়ে বিল্‌কুল্ বোকারাম। দায়ের মার খেয়েও তারা দাঁও মেরেছে ভাবে। ভেবে হাসতে হাসতে ফিরে যায়। মাথায় বাড়ি খেয়ে বাড়ি যায়, গিয়ে যেন রাজ্য জয় করে এসেছে বলে' বাড়ি মাথায় করে।

ত্রিবিক্রম ট্রেলারের আড়তদারের সঙ্গে টেলিফোনে বাক্য-বিনিময় করে। ছিপ বঁড়শি থেকে সুরু করে ট্রেলার পর্যন্ত মিলিয়ে দাম ফেলা হয় মালের, ত্রিবিক্রম তার বিল কাটতেই ভদ্রলোক তাঁর চেকবইটা বার করেন।

চেক কাটতে না কাটতেই ট্রেলার এসে খাড়া। দেখতে না দেখতেই।

মালপত্র সব ট্রেলারে তুলে দেবার পর সেখানাকে টেনে নিয়ে গাড়ীর

সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হয়। ত্রিবিক্রম ভদ্রলোককে মোটরে তুলে দিয়ে নমস্কার জানিয়ে আসে।

ভাগনে দোকানে ফিরতেই মামা এগিয়ে যান তার কাছে—'চমৎকার! চমৎকার!!' বলতে বলতে উছলে ওঠেন তিনি—'বেচবার আদবকায়দা জানো বটে ছোকরা! কিন্তু ভদ্রলোকেরও সখ বলতে হয় বাপু। মাছ ধরার এমন ঝোঁক বড় একটা দেখা যায় না। এমন খদ্দের কালে-ভদ্রেই মেলে।—' না বলে' পারেন না রামকানাই, ভাগনের যোগ্যতার তারিফ করলেও তালকানা তো নন—'তা, লোকটি বুঝি খালি একটা ছিপ কিনতেই ঢুকেছিল?'

'ছিপ কিনতে? কোনো জন্মে না।' ভাগনে জানায় মামা কানাইকে: 'ছিপ কিনতে আসবেন কেন? আমাদের মনোহারী বিভাগে অয়েল ক্লথের দর করছিলেন। যাচ্ছিলাম আমি পাশ দিয়ে। তাই থেকেই তো টের পেলাম। ওঁর বৌ যে আঁতুড়ঘরের যাত্রী বোঝা গেল তাইতেই। অয়েল ক্লথ কেনার পরে…'

'এমন দিনে তারে বলা যায়।'

'অয়েল ক্লথ?'

'আলবৎ। সেখানকার কেনাকাটা সারার পর আড়ালে ডাকলাম তাঁকে আমি। বললাম, সময়টা তো ভারি খারাপ আসছে আপনার। নিঃসঙ্গই থাকতে হবে কিছুকাল এখন। তা এক কাজ করুন না, একলা একলা মনমরা হয়ে না থেকে—সময়টা বেশ ফুর্তিতে কাটে, আবার কাজেও লাগে, এমন কিছু করুন না কেন! এভাবে একলাটি ভেবে ভেবে না কাটিয়ে এই বিশ্রি দিনগুলো যাতে আরামে কাটে তেমন কিছু করতে পারলে চাই কি, এমন মন্দার সময়ও আপনার নেহাৎ মন্দ বলে মনে হবে না, বরং একটা স্বর্ণ সুযোগ বলেই বোধ হবে আপনার, তাই···বললাম আমি ভদ্রলোককে—মাছ ধরলে কেমন হয়?'

বিনির ধারণা আমি ঠকতেই জন্মেছি—কিছু কিনি আর নাই কিনি। কিনলে তো কথাই নেই, দোকানদাররা ওৎ পেতে আছে কখন্ আমি কান দেখাই। আমার বিলম্বিত ওটি দেখতে পেলেই আর বিলম্ব করবে না—কানটি মলে আমার···কেবল যে শুধু টাকাগুলোই গচ্ছা যাবে তাই নয়, চড়া দামে বাজারের যতো পচা মাল গছাতেও ছাড়বে না।

এমন সময়ে অনিমেষ ওভারকোটের খবরটা আনলো। আর সেই কোট কিনতে গিয়েই বিনির কথাটা যে কদ্দূর খাঁটি হাতে-নাতে টের পাওয়া গেল। হাড়ে হাড়ে যাকে বলে।

কলকাতায় শীত পড়ে বড়োজোর পনের দিন। মানে, খুব জোরালো শীত। মাঘের সেই রাগের সময়টা কম্বলের সঙ্গে চাদর জোড়া দিলেই চলে যায়। রাতটা বেশ আরামে কাটে। জারা-সে হি হি করলেই কেটে যায়।

লেপ আমার সয় না। লেপের ওপরে লেপের প্রলেপ—ধারণ করা দূরে থাক, ধারণাই করতে পারিনে।

কিন্তু ঐ শীত-পক্ষে কোথাও বেরুতে হলে? নিজের কোটরে থাকাই সব চেয়ে ভালো কিন্তু কার্যগতিকে যদি বাইরে যেতে হয়? তখন তো কোট একটা চাই?

চাই-ই। (পুনরুচ্চারিত এই দ্বিতীয় ইকারটি অনিমেষের।)

চুনোগলির কোথায় সে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পোষাকের দোকান দেখেছে। সেখেনে কোট, ওভারকোট, বর্ষাতি, বিলিতি স্যুট্ এ সবের

কেনাবেচা হয়। সমস্তই খুব সস্তায় মেলে। তবে কি না, বেচতে যতো সস্তা কিনতে গেলে তাব চেযে একটু বেশিই লাগে অবশ্যি।

'সেটা বলা বাহুল্য মাত্র।' সায় দিলো বিনি।

'বাহুল্য মাত্র।' আমি শুধু বল্লাম। কেনাব বিরুদ্ধেই বললাম। —'ওভারকোট কেনাব কোনো মানে হয় না।'

আমার ভোট কোটের বিপক্ষে—'যাবা বিয়ে কবেনি কোট তাদেব সয় কখনো? সে সহনশীলতা কি অনূঢ়দেব আছে?'

'না দাদা, শীতটা এবাব বেশ পডবে মনে হচ্ছে। এখনি তাব আভাস পাচ্ছি—' বিনি নিজের কোটে থাকে। সেখান থেকে এক চুল নডে না।

'বিয়ের সঙ্গে কোটেব কি গা?' অনিমেষ জিগায।

'চশমাব ভর যাদের সয় না—কোটেব ভাব তাবা বইতে পাবে?' আমার কোটালে জবাব।

'কোটেব সাথে চশমাব কী?' নিজেব অনিমেষ-দৃষ্টি দিযেও সে দেখতে পায না। আমাব দিকে তাকায়।

ব্যাখ্যা করতে হয় আমায। অভ্যাসযোগেব মতো অনভ্যাসযোগ বলেও একটা আছে। গীতায অনুল্লিখিত থাকলেও জিনিসটা থেকে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—ইত্যাদির এত উৎসাহ বচন সত্ত্বেও।

ব্যাপারটা সোজা। অবিবাহিতরা অনভ্যাসবশতই ভার-বহনে অক্ষম। বৌ হচ্ছে ঠিক চশমার মতই। সর্বদা চোখে চোখে রাখবাব জিনিস। তাই রেখে রেখে, তাই থেকেই চশমার অভ্যেস গজায়। তারপরে যখন তারা চশমা নেয় তখন সহজেই তা পরতে পারে,—চমৎকার মানায়ও তাদেব।

আপনি জানেন না !

তাদের নাকের ডগায় তা অবলীলায় থাকে। মুখের কেল্লা রক্ষা করে, চোখের জেল্লা বাড়ায়।

অনভ্যস্ত অন্য লোকের বেলায় কিন্তু চোখ কর্‌কর্‌ করে, নাক চড়চড় করে, কানে শুড়শুড়ি লাগে। তাছাড়া, তারা চশমা ভাঙে—এন্‌তার। নিজের চশমাই। কখনো একটা ডাঁটি, কখনো লেন্‌স্‌, কখনো বা গোটা চশমাটাই। একখানাকে চারখানা করে—আক্‌চার। আর যদি নাও ভাঙে, দরকারের সময় খুঁজে পায় না। তাদের চশমা কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না। (সে এক গুহ্য রহস্য—একান্তই যদি তাদের ভুরুর ওপরে উহ্য না থাকে ; এবং সেটা খুব কদাচই ঘটে। নিতান্ত চশমার কপাল না হলে চশমার এই কপালক্রম কখনো ঘটে না।)

এবং তা ছাড়াও……

তা ছাড়াও আরো আছে। আর, সেইটেই হচ্ছে মুখ্য। চশমা নিলে মুখরক্ষা হয় না। সম্মুখীন লাভে বঞ্চিত থাকতে হয়। চশমা রাখতে গেলে মুখ থাকে না। মুখ রাখতে গেলে চশমা যায়। দুজনেরই যেতে পারে। তবে বেশির ভাগ পরেরটাই যায়—পরাক্রমটা তার ওপরেই হয় কিনা !

'আরেকজন আসছে কোত্থেকে এখেনে ?' অনিমেষের প্রশ্ন—নিতান্ত মেয়ের মতই।

'মানে, তিনি যদি চশমাধারিণী হন। সেই কথাই বলছি।' চশম্‌খোরের মতই ব্যক্ত করতে হয় কথাটা—'আমন্ত্রণ একেবারে মৌখিক হলেও পেটুক লোক তো না এগিয়ে পারে না !'

'কিসের থেকে কিসের কথা !' মুখ বিকৃত করে সে—'হচ্ছিল কোটের কথা—'

'একই কথা। বিয়ের বদভ্যাস থেকেই আসে। বৌয়ের থেকে যেমন চশমার শিক্ষা, শালীর থেকে তেম্‌নি কোটের দীক্ষা। শালীও কি বিয়ের আমদানি নয়?' আমার পাল্টা-জিজ্ঞেস।

'শালী আবার কী করলো তোমার?' অনিমেষ হতবাক।

'করবে আবার কী? কিছুই না। যা হবার তাই হয়।' আমি জানাই—'মানুষ একচোখো চিরকাল। বৌকে চোখে চোখে রাখলেও শালীর দিকেও তার নজর থাকে। স্বভাবতই তার একটা চোখ সেইদিকেই।...'

'কৌটিল্য' দর্শন

চশম্‌খুরির পর এক-চোখোপনার কথা আসে, এসে পড়ে, শালীনতা বজায় রাখা যায় না—'আর, শালীরা সব গায়ে-পড়া। প্রায় ওভারকোটের মতনই। যদিও ঢের হাল্‌কা আর একটু সুগারকোটেড্‌, তাহলেও কিছু না কিছু ভার তো তার আছেই?'

'তোমার যতো খালি গা-জড়ানো কথা।' অনিমেষ গালি দেয়: 'কোটরা শালীর মত জড়ায়—কি, শালীরা কোটের ওপর গড়ায় এ সব আমি শুনতে চাই নে। আসল কথা বলো।' আসলের তলব ওর।

'আসল কথায় আসতে চাও? তাহলে শোনো, বিবাহযোগে ভার-বহনের যোগ্যতা যার জন্মেছে—কেবল সে-ই পারে তোমার ওই

ওভারকোট বইতে। একমাত্র ভারবাহী জীব ছাড়া—মানে, এককথায়, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য!'

এক কথায় বুঝিয়ে দিই। প্রবাসীর হেড পিস্ ছুঁড়ে লাগাই হতভাগাকে। বেহেড্‌টাকে।

তবুও অনিমেষ অবুঝ। উজ্‌বুকের মতই বলে, 'বুঝেচি। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিসে তোমার রুচি নেই। পরের গায়ে-দেয়া জিনিস গায়ে দিতে তুমি নারাজ—এই তো?'

'শালীও তো পরের জিনিস গো! নিজের কি? কিন্তু বিয়ের পরে পরচচাটা অভ্যেসে দাঁড়ায়, তখন হাল্‌কাই হোক্ আর ভারীই হোক্, যদি আপনার থেকেই এসে যায়—'

'যাও, বাজে বোকো না।' বিনি আমাদের মাঝে দ্বন্দ্বসমাসের মধ্যেকার হাইফেনের মত আসে—'আপনি দোকানটার ঠিকানা দিনতো অনিমেষদা। আমি আজকেই দাদাকে নিয়ে সেখানে যাবো।'

বিনি নিজের কোট্ বজায় রাখে। সেদিন বিকেলেই আমাকে নিয়ে বেরোয়।

পথে যেতে যেতে সে বোঝায়, নাই বা হোলো নিজস্ব মৌলিক, কিন্তু কোট তো? আমার গায়ে থাকলে আমারই কোট, পরের যে তা অপরে জানবে কি করে'? এমন কি, যে-হতভাগা বেচে গেছে সেও টের পাবে না দেখলে। ধরতে পারবে না চট করে। কিছুতেই ভাবতে পারবে না যে—

তাছাড়া, এ-বাজারে একটা আত্মনেপদী কোট বানানোর মানে—। মানে, প্রায় পাঁচশো টাকাই। তার চেয়ে পরের উদ্ধৃতি—পরস্মৈপদী

কোটেশন্ সস্তা কতো! বিশ পঁচিশ টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। আমাদের অবস্থার কথা ভাবলে……

ঈষৎ কটু শোনালেও বিনির কথা বিনাপ্রতিবাদে সয়ে যাই। শুনতে শুনতে যাই। শেষে একটা কথা বলি—'পছন্দর ভার তোর, কিন্তু দরদস্তুর করবো আমি। দেখিয়ে দেব তোকে, জিনিস আমি দাঁওয়ে কিনতে পারি কি না। কেমন আমি ঠকে আসি দেখবি!'

হ্যাঁ, আমারো একটা কথা থাক্! কেনাকাটার এ-বি-সি-ডি না জানলেও, ওর শেষ কথাটা আমার হোক্। জেদ বজায় থাক আমার।

আমার z-এর বিরুদ্ধে বিনি কিছু বলে না।

ঠিক জায়গায় এসে একটু এদিক ওদিক চাইতেই ঠিকানা মিললো। চুনোগলি আলো-করা ঝুনো সাইনবোর্ডখানা চোখে ঠেকলো আমাদের—তাতে লেখা—

'সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কোট প্যাণ্ট স্যুট ওভারকোট অলেস্টার ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি সব রকমের পোষাক-পরিচ্ছদ এখানে সর্বদা খরিদ বিক্রয় করা হয়। একেবারে নতুনের মত, দাম অতিশয় সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

প্রার্থিত পরীক্ষা-কেন্দ্রে আমরা পদার্পণ করলাম।

দোকানে ঢুকতেই র‍্যাকের ওপরে রাখা একখানা দেখা গেল—সেইটেই পছন্দ হোলো বিনির। ধূসর রঙের ওভারকোটটা, মন্দ নয় নেহাৎ, রঙটা ধূসর হলেও রঙচটা না, ধূলিধূসরিত নয়। ভদ্রজনোচিত বেশ। তবে কোটের ছাঁট-কাটগুলি একালের নয়, অনেকদিন আগেকার কোটানো।

'হালের ফ্যাশান্ না।' আমি বলি—'ফ্যাশানের হাল দেখলেই মালুম হয়।'

'তা হোক্', বিনি বললো : 'টাকা পঁচিশেকের মধ্যে হবে মনে হচ্ছে।'

যাক্ গে, আমি আর কিছু বললাম না। ওর পছন্দেই আমার পছন্দ। মিল বজায় রাখতে গিয়ে টাকার ছন্দটাও তো দ্রষ্টব্য। কোটটা কাঁধে করে এগুলাম কাউণ্টারের দিকে। দোকানদারের সঙ্গে পাল্লা দেবার পালা এবার আমার।

কাউণ্টার ফাঁকা, কেউ সেখানে নেই। নেপথ্য থেকে একগাদা স্বরলহরী ভেসে আসছিল, তার থেকে দোকানের মালিক এখন টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত টের পাওয়া গেল।

বাক্যালাপ সেরে পশ্চাৎদ্বারভেদ করে' তিনি এলেন। দেখবামাত্র বোঝা যায় যে ঝানু ব্যবসাদার। সোজা লোক নন্, সজারুর মতন লোক। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ দেখলেই তার ছোঁয়াচ মেলে।

আমার আপদমস্তক এক পলক চোখ বুলিয়ে আমারো বুঝি তিনি আঁচ পান। একটি দৃষ্টিপ্রসাদেই আমাকে হজম করে তার পরে তিনি আঁচান—

'আজ্ঞা করুন অধীনকে ?'

'দেখুন এই ওভারকোটটা……' ওটাকে আমি তার কাউণ্টারের ওপরে রাখি—'এইটে আমার……'

এতক্ষণে আমার থেকে কোটের ওপরে ওঁর নজর পড়ে—'ও, এই কোটটা ? একটা ওভারকোট দেখছি !'—দোকানীর গলায় দুঃখের সুর বাজে—'স্যুট টুট নয়, শুধু একটা ওভারকোট ? স্যুট হলেও না-হয় কথা ছিল।'

আপনি কী হারাইতেছেন

'না, স্যুট টুট নয়। একমাত্র এই ওভারকোটটাই……' একটু থতমত খেয়ে আমি বলি।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো ভদ্রলোকের: 'গরমকোট, তাও আবার হাল্‌কা রঙের।' ঘাড় নড়তে লাগলো তাঁর—'অবশ্যি, এটা যদি একটু জম্‌কালো রঙের হোতো তাহলেও না হয় আমি…কিন্তু এই হাল্‌কা ধোঁয়াটে রঙের……' বল্‌তে বল্‌তে, যেন অন্যমনস্কতার বশে, তাঁর আঙুলগুলি কোটের ওপর চলতে থাকে, জিনিসটার মালঝাল তিনি পরীক্ষা করেন নিজের অগোচরেই……

'বাজার যা পড়েছে মশাই, বিশেষ করে' এই সময়টায় ……।' তিনি বলেন।

তাহলেও এই মন্দার বাজারেই মন্দ কোটটাকে ব্যাজার-মুখে তিনি তুলে ধরেন, যেন একটু সরূপ হয়েই। অকৃপণ হাতে তাঁর থাবার মতন আঙুলগুলি কোটের ওপর চালান্ আবার। তার এধারে ওধারে, সারা গায়, গলায়, তলায়, ধারে ধারে, সেলায়ে—পকেটে। তলার থেকে কলার্ অব্‌দি—এপিঠ ওপিঠ—কোনো দিকই বাদ যায় না। তারপরে তিনি ওটাকে আলোর সামনে মেলে ধরেন।

মাথা নড়তে থাকে তাঁর—আপনা থেকেই। কিন্তু উত্তর দক্ষিণে নয়—পূর্ব-পশ্চিমে। ম্যাপ্‌সই তাঁর এই নিরুত্তর মাথা নাড়ার থেকে তাঁর মেজাজের পরিমাপ করার আমি আন্দাজ পাই।

হঠাৎ যেন কী আবিষ্কার করে একটু তিনি উস্‌কে ওঠেন—'আহা হা, এই যে—দেখুন না! এর বগলগুলো দেখেছেন একবার? কী ছিরি হয়েছে বগলের!' তাঁর হাহাকার শোনা যায়।

বিগলিত হবার মত নয়, তা ঠিক। কিন্তু তা হলেও, একটু সলজ্জ-

আপনি জানেন না !

বোধ করলেও যাকে বগলিত করতে যাচ্ছি তার স্বপক্ষে একটু বলতেই হয়—'দেখুন, কোটিপতিরা যে সব কোটের পতি, এটি তাদের প্রতিনিধি এমন কথা আমি বলি নে। তেমনটি না হলেও—সব খুঁৎ টুত মেনে নিয়েও—এ সব সত্ত্বেও···কোটটা এমন কিছু খারাপ নয়—সব দিক গুণিয়ে দেখলে—শীতকালের কাজ চালাবার মতন নয় কি এই কোটটা? আপনিই বলুন?' তাঁকেই আমি জিগেস করি।

COAT এর ওপর কটূক্তি !

কোটের তুমি তো বোঝো কচু—এই রকমের কঠোর একটা চাহনি হানেন তিনি আমার দিকে। কী যেন ভাবেন খানিক।

'আপনি তো বলবেনই···কিন্তু পরে যখন এই জিনিস নিয়ে আরেক-জনকে বেগ পেতে হবে

'কাউকেই এটা নিয়ে কোনো বেগ পেতে হবে না কখনো।' বলে' গোড়াতেই আমি তাঁর উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করি। আমার কথায় তিনি কোটটাকে আরেকবার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখেন।

কোটটার খুঁটিনাটি নিয়ে বড্ডো বেশি নাড়াচাড়া হচ্ছে আমার মনে হয়। নিঃসন্দেহই এটা খুব উঁচুদরের নয়, বিশেষত বগলের দিকে

নজর দিলে পাগলের মত হতে হয় তাও ঠিক, আদরের তেমন ইচ্ছে করে না তাও বটে, কিন্তু এটাও তো সত্যি যে আমরা সাধ করেই তাঁর দোরে এই জিনিস গায় পড়ে নিতে এসেছি। তাই নয় কি? অতএব কোট নিয়ে ঘোঁট আর না বাড়িয়ে সরাসরি দামের কোঠায় নেমে আসাই আমার ভালো মনে হয়।

'দেখুন, এর দামটা এবার ন্যায্য কী হবে ঠিক করে' বলুন তো?'

সোজাসুজি বলে' ফেলি। বেশী দরাদরি আমার পোষায় না। বিনি অবশ্যি পাশের থেকে আমায় টেপে। আমার স্বাক্ষরের ওপর সেটা ওর টিপসই কি না—বুঝতে পারি না ঠিক।

'দাম? হুঁ···বগলটা তো দেখেছেন, এবার গলাটাও দেখুন। দেখুন একবার কলারটার চেহারা ··(কাঁচকলার মতন কালো চেহারা। আমি দেখি।) কি রকম ময়লা জমেছে দেখুন না! কাচলে কি আর উঠবে এ? ধোলাই দিলে কে জানে কলারটাই না উপড়ে আসে! তারপরে··· ·আচ্ছা, আপনিই বলুন না—কতোই বা দাম হতে পারে এর?'

এবার আমি ভয় খাই রীতিমতন। আমার ঘাড়ে দামের ভার চাপালে নির্ঘাত আমি ঠকে যাবো। ওঁর দরের বেশী দিয়ে বসবো ওঁকে। আমার বিষয়ে বিনির এই বিশ্বাস হয়তো একেবারে অমূলক নয়। পাছে ঐ লোকটার দরের চেয়ে বেশী চড়িয়ে বসি সেই ভয়ে হাতে একটু রেখেই এগুতে হয়। অবশ্যি, অমায়িক ভদ্রলোক নিজের জিনিসের যতই নিন্দা করুন না, সত্যি বলতে, ওভারকোটটা ভালোই বেশ। রাজকোট না হতে পারে, কিন্তু নেহাৎ কটকও নয় তাই বলে'! গায় দিলে কোর্ট-মার্শালের ভয় নেই,—মার শালাকে বলে তেড়ে আসবে না কেউ। ঘেউ

ঘেউ করে ফেউয়ের মত পিছনে লাগবে না কুকুর। না, কটুকাটব্য করার মতন এমন কিছু নয়।

এবং ভেবে দেখলে—আমিও রাজপুত্র নই, মন্ত্রীপুত্রও না—তেমন ছিনিমিনি খেলার রূপোলি খোলামকুচিই বা কই আমার? দরদামের কেনাকাটার ব্যাপারে কোটালপুত্রের ন্যায় কাটতে কাটতে এগুনোই আমার পক্ষে নিরাপদ। আক্রমণাত্মক আত্মরক্ষা যাকে বলে। নিজেকে বাঁচিয়ে পরাক্রম। চেপে চেপে, চোপে চোপে, ঝোপমতন কোপ বসাও। দা মারা আর দাঁও মারা এক কথা যেখানে।

'টাকা দশেক দাম হলে কেমন হয়?' আমি শুধাই।

শুনেই তিনি চম্‌কে ওঠেন।—'দশ···? দ—শ টা—কা!' আর্তনাদ ছাড়েন একখানা—'এই কোটের দাম দশ টাকা? হা ভগবান!!'

বলে' তিনি শিবনেত্রে একবার কড়িকাঠের পানে তাকান—ক্রুশবিদ্ধ যিশুখৃষ্টের মতই। তারপরে তাঁর কড়ি-নজর কোমল করে আনেন আমার দিকে—'দশ টাকা দামটা কি ঠিক ন্যায্য হচ্ছে মশাই? আপনিই বলুন না?'

'আপনিই বলুন।' আমি প্রতিধ্বনি করি।

'আমি বলি চার টাকা।' তিনি বলেন। গোবেচারার মতই।

চার টাকা! চার টাকা মাত্র এর দাম? তাহলে তো বিনি ঠিক কথাই বলে। পদে পদেই আমি ঠকে থাকি। আহাম্মকের মত দশ টাকাই দিয়ে বসেছিলুম তো— আরেকটু হলেই?

সামলানো গেছে খুব। তবে এতে আমার নিজের বাহাদুরি তত নেই, বরং ঐ-লোকটার সৌজন্যই! ওঁর জন্যই বাঁচলাম। সাধু ব্যবসায়ীর সততাই আমাকে বাচিয়েছে। কিন্তু তাই বলেই এই ভালোমানুষির

সুবিধে নেয়া কি আমার উচিত হবে? না, কখনই না। হোক গে আমার লোকসান, এমন লোককে আমি ঠকতে দেব না। না হয় বাড়তি কিছু দেয়ার জন্যে ঘাট্‌তি হবে আমার। আমার ঘাট হবে। তা হোক্। তাহলেও ভদ্রলোকের চারুতায় নাচার হতে হয়। চারের ওপর আরো কিছু দেবার বাসনা মাথার মধ্যে চাড়া দেয় আমার।

'চার টাকাটা কি বড্‌ডো বেশী কম হচ্ছে না মশাই?' আমি ওঁর হয়ে বলতে যাই।

'বেশ, তাহলে…পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকাতেই রফা হোক।' হাতের পাঁচটা আঙুল আমার চোখের ওপর তিনি ঠেলে দ্যান—পাঞ্জাখানা প্রাঞ্জলভাবে মেলে ধরেন—'পাঁচ টাকার এক পাইও বেশী নয় কিন্তু?'

না। এমন লোক হয় না। এমন সদাশয়, সৎ, সাধু—কালো-বাজারের ঠিক উল্‌টো দিক—একালে এমনটা দেখা যায় না আর। সচরাচর এই পাপ-নজরে পড়ে না। অনিমেষ বলেছিলো খাঁটি, একেবারে, মাটির দর এখেনে। কিন্তু খালি দোকানের দরই নয়, দোকানদার-মানুষটিও যে মাটির, এতটা আমি ভাবতে পারি নি।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোটখানা বার করি।

উনিও দেখি সেই সময়ে ওঁর কোমর থেকে একটা ময়লা গেঁজিয়া টেনে আনেন। ছোট্ট থলেটা ছোট বড়ো নিকেল চাক্‌তিতে ভর্তি। তার ভেতর থেকে পাঁচটাকার মত বের করে' গুণে গেঁথে সামনের কাউণ্টারের ওপর রাখেন। ছোট্ট একটি অশোক-স্তম্ভের মতই।

তারপরে গোনাগাঁথা সেই সমস্ত মোট আমার হাতে তিনি চাপিয়ে দেন।

কী হচ্ছে এ ? অ্যাঁ ? লোকটা এ করছে কী, অ্যাঁ ? যতই তাকাই ততই আমার তাক্ লাগে।

বামুনের ছেলেকে খাওয়ালে দক্ষিণা দিতে হয় জানি, কিন্তু অন্ন ব্যতীত, অন্য দানের সঙ্গে দক্ষিণার আদান-প্রদান অন্যায়। বস্ত্রদানের সঙ্গে দক্ষিণাদান—এ আবার কী ব্যাপার ? কোটটাও উনি অম্‌নি অম্‌নি দেবেন, আবার তার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ—পাঁচ টাকা জরিমানাও ? এরকমের দান-ব্রতের কথা তো শুনিনি কখনো। ভূভারতেও না। তাহলে এই কলিকাল কি পাল্‌টে গেল নাকি ? আমার কেমন ভ্যাবা-চাকা লাগে। নিকেলের চাকাগুলো হাত পেতে নিতে রাজি হতে পারিনে কিছুতেই।

দাঁও মারার দৌড়

কিন্তু উনিও নাছোড়-বান্দা। দেবেনই। নিজগুণেই নিজের গুণকার দেবেন।

'না···কিছুতেই না।'··· আমি মরীয়া হয়ে উঠি : 'আমাকে আপনি অমন করে' প্রলুব্ধ করবেন না। এ আমি কিছুতেই নিতে পারব না। মারা গেলেও নয়। মাপ করতে হবে আমায়।'

বলে' কোটখানা না ঘাড়ে ফেলে, নোটখানা ওঁর হাতে গুঁজে দিয়েই —চট্ করে আমি বেরিয়ে আসি দোকান থেকে। বিনিসমেত—এক ছুটে।

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে' তাকিয়ে থাকে—আমাদের তিরোধানের দিকে। তীর্যক নেত্র ফিরিয়ে আমি দেখতে পাই।

'ইস, কী সাংঘাতিক লোক রে।' বিনিকে বলি—'এ রকম যার-পরনাই ভালো লোকরা কী মারাত্মক হতে পারে—বাপ! আরেকটু হলেই আমাকে চিরঋণী করে রেখেছিল আর কি!'

বাইরে এসে আমি হাঁপ ছাড়ি।

ফিরতি পথে দোকানের দোরগোড়ায় বিনি কী-একটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। একখানা টিকিট্। তার গায়ে লেখা—দামী ওভারকোট—প্রায় নতুনের মতই। দাম ৩৫৲।

'এখানে র‍্যাক্ থেকে তুলবার সময় কোটটার গা থেকে টিকিটখানা খসে পড়েছিল মনে হচ্ছে', বিনি বলে: 'কিন্তু যাই বলো না দাদা, পঁয়ত্রিশ টাকার জিনিসটা পাঁচ টাকায়—খুব দাঁওয়েই পাওয়া গেছে। তাই না?'

'পাওয়্যালো কে শুনি একবার? এই দাদাই তো?' বলে' একবার কোটের—আরেকবার বিনির দিকে আমি কটাক্ষ করি: 'দাঁও নয়। বল্—দাদাঁও।'

গালে হাত দিয়ে বসে আছি……ভাবছি বসে বসে……

প্রিসিলা এসে ঢেউয়ের মতন ভেঙে পড়লো……আমার অচল শিলাস্তূপের সামনে……

'গালে হাত দিয়ে কী ভাবছ মেজমামা ?'

'কতো কী-ই তো ভাবা যায়। হাতের এই যে বাজে খর্চা—গালে খাবার না দিয়ে শুধু শুধু হাত দিয়ে থাকা—এই সব অপব্যয়ের হাত থেকে কি করে বাঁচা যায়—তাও তো ভাবতে পারি ?'

গাল-গল্পের মুখবন্ধ

'নাও, আর ভাবতে হবে না। এই চকোলেট খাও।' প্রিসিলা আমার গালে তুলে দেয়।

আমি ওর চকোলেটকে গাল দিই—যা মুখে আসে! তারপরে আমার খালি হাতখানাই ওর গালে তুলি—আদরের নরম গালিচায়। ওর চকোলেটের বিনিময়ে। (এর নাম ফেয়ার এক্সচেঞ্জ।)

'আচ্ছা মেজমামা, বলো তো, যখন তোমার শরীর ভালো নয়—গা

ম্যাজ ম্যাজ করছে—চোখ ছলো-ছলো—মাথা ভার-ভার—গা হাত পা ভারী—এক একটা যেন এক মণ—'

'উঁহু, দু মণ।' আমার ভ্রম-সংশোধন—'একমন হতে পারলে তো হোতোই রে! জীবনে অনেক কিছুই করতে পারতাম। দু-মনা হয়েই তো গেলাম।'

'আহা, তোমার নয় গো। আমার নিজের কথা বলছি, তুমি যে এক মণ চল্লিশ সের, তা আমার জানা আছে। তোমার হয়নি—হয়েছে আমার। কেবল মন ভার নয়, গা-গলা-হাত-পা সব ভার ভার। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছে—সর্দি হয়ে জ্বরো জ্বরো ভাব—নাক শুড় শুড় করছে—'

'গান গাইবার জন্যে।' আবার আমার বাধাদান—'নাক থেকেই যে সুর বেরোয়। গাইয়ে আর হাতী দুজনকারই। গেয়ে ফ্যাল্ কিম্বা হেঁচে ফ্যাল্। যা তোর খুশি।'

'হ্যাঁ, হাঁচিও আসছে। নাক ফ্যাচর ফ্যাচর করছে—'

'তার হ্যাঁচকা টানে হাঁচিরা আসবেই। বলে, আমাকেই নাকাল করেছে কতোবার!'

'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে—নাক দিয়েও। গা জড়াচ্ছে। ইচ্ছে করছে বিছানায় গিয়ে কাত হই—আর কেউ এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিক! এম্‌নি অবস্থা, আর মনে করো, এমন সময়ে কেউ যদি এসে আদিখ্যেতা করে তোমায় বলে—বাঃ, বেড়ে দেখছি তোমাকে আজ—তাহলে তোমার কী ইচ্ছে করে, বলো তো?'

'মরতে ইচ্ছে করে।'

'মারতে ইচ্ছে করে আমার। ইচ্ছে করে যে চটাস্ করে তার গালে একটা চড় কসাই।'

'তুই চটে যাস। বুঝলাম।' আমি গাল নাড়ি—চকোলেটটাকে ভালো করে গালাই—'কিন্তু অমন চট্ করে কি চট্‌তে আছে? কসাই হওয়া কি উচিৎ মেয়েদের?'

'চটবো না? কাল আমার কী হয়েছিলো তুমি জানো? এত খারাপ লাগছিলো যে কী বলবো। তবু আমায় বেরুতে হোলো বাইরে। কেনাকাটার কাজ ছিলো দু' একটা। তাছাড়া, আমার নতুন শাড়িটা কালকেই পরে বেরুবো ঠিক করে রেখেছিলাম—'

চটিতং প্রিসিলা শাড়ির কথায় এসে ফের চটুল হয়।

'অসুখের ওপর শাড়ি কেন? শুকসারি, কথায় বলে। শাড়ির সঙ্গে সুখ জড়ানো। একেবারে গায়-গায়। অসুখ সারিয়ে তারপরেই পরলে পারতিস!'

'আগের থেকেই ঠিক করা ছিলো যে! কোন্ শাড়িটা কবে পরবো—কোন্ ব্লাউজের সঙ্গে, কার সঙ্গে কি ভাবে ম্যাচ করে—আমার আগের থেকেই ঠিক করা থাকে।'

'একেবারে তারিখ দিয়ে? ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচের মতন? বলিস কিরে?' আমি অবাক্ হই।

'নিশ্চয়। আপ্-টু-ডেট মেয়ে হওয়া কি চারটিখানি?.....যাক্, যে-কথা বলছিলাম.....নতুন শাড়িটা পরে বেরিয়েছি। এঁচে রেখেছি তাড়াতাড়ি কাজ সেরেই ফিরবো। বাড়ি ফিরেই সটান্ শুয়ে পড়বো বিছানায়। কিন্তু বরাতে থাকলে তো!'

'কেন, কী হোলো?' আমি সোজা হয়ে বসলাম। কোনো মেয়ের বরপক্ষ বা বরাতপক্ষে গোলোযোগ ঘটা আমি ভালো বোধ করি না।

'পথে দেখা হোলো বেবার সঙ্গে। তার সেই কালো কুচকুচে ভাইটা—শ্যামলকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে বেরিয়েছেন! একই ফুটপাথে মুখোমুখি হয়ে গেল।'

'হোলোই বা! রেবার সঙ্গে মুখোমুখি হলে কারো তো খারাপ লাগবার কথা নয়।' আমি বলি—'দেখেছি তোর বেবাকে। মুখের দিক দিয়ে অন্ততঃ মন্দ না নেহাৎ।'

শ্যামলের দিব্য দর্শন

'একখানা কালো মেঘের মতই সে ভেসে এলো যেন। এসেই শুরু করলো বর্ষণ। ঝাড়া আধঘণ্টা চললো তার গজালি। নামটিই নেই থামবার। নিজের নানান্ অসুখ বিসুখের খোস-খবর শুনিয়ে—সমস্ত খুঁটিনাটি বলে অবশেষে বললো—আহা ভাই, তোর মতন যদি দিব্যি শরীর পেতাম—অমন স্বাস্থ্য যদি হোতো আমার—

আমি বাধা দিয়ে বলতে গেলাম— আমার শরীরটাও ভাই আজ—

'শ্যামল বলে উঠলো মাঝখান থেকে—শীলাদিকে দিব্যি দেখাচ্ছে আজকে। না মেজদি?

'শুনেই আমার গা যেন জ্বলে উঠলো। ইচ্ছে হোলো—কী ইচ্ছে

হোলো বলবো তোমায় মেজমামা ? ইচ্ছে হোলো যে দিই কসে' এক বাড়ি শ্যামলটার মাথায়।'

'দিলি না কেন ? মাথাটা খুলতো ছোঁড়াটার, যা নিরেট !' বলে আমি গুন্‌গুন্ করলাম : 'রেবা নদীর তীরে। এম্‌নি বারি ঝরেছিলো— শ্যামল-শৈল-শিরে ॥'

'যাক্ কোনোরকমে তো ভাইবোনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। কিন্তু যেই না একটু এগিয়েছি অমনি ফের মণিকার সাথে দেখা। সেও বেরিয়েছে রাস্তায়। সেইদিনই।

'কেমন আছিস ভাই প্রিসি ?' বলে এসেই সে সুরু করলো। ওর কথার জবাবে ভালো নেই জানাতে যাচ্ছি—কিন্তু আমি হাঁ করার আগেই নিজেই সে ওগরালো। জোর গলায় বল্লে—বাঃ, ভালোই আছিস তো বেশ। ভালোই দেখাচ্ছে তোকে। দিব্যিটি।'

'দিব্যিই আছি, হ্যাঁ—হ্যাঁ·····হ্যাঁচ্‌চো' সায় দিলাম আমি ওর কথায়।

'মণিকাকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়েছি, আরেকজনা এসে হাজির। কোন্‌দিক থেকে যে এলো কে জানে !·····'

'দিগঙ্গনা কি না ! যে-কোনো দিক থেকেই আসতে পারে।' দিগ্‌গজের মত আমি বলি।

'এসেই সে কথা পাড়লে—'ইস্ প্রিসি, কী হয়েছিস্ রে ! এমন সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে যে···আহা, তাজা রক্তে টক্‌টকে গাল। ঠিক আপেলের মতই লাল। বেশ ভালোই আছিস বোঝা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ভালোই।' বলে' আমি নাক ঝাড়লাম। নিজের বোঝা নামালাম।

'কিন্তু ন্যাকা মেয়ে আমার নাকের ভাষা বুঝলে তো! বাধ্য হয়ে, ঝাড়বার পব, ওব শাড়িতে নাক মুছতে গেলাম আমি।

'বল্লাম—ভাই, আমার নতুন শাড়িটা, আজকেই পরেছি সবে—এটা আমি নষ্ট করতে চাই নে। তোর শাড়িতেই আমার নাকটা—

'তখন সে পালালো—আমার নাকের বিপাকের থেকে বাঁচতেই।'

মৈনাক, সৈনিক হও—বলে' একটা কথা যেন কোথায় শুনেছিলাম! কবিতাই যেন, আমাব মনে পড়ে। কিন্তু সে কি—ঐ নাক লক্ষ্য করেই? কে জানে!

'মেয়েটাকে অমন করে নাকাল করলি? ছিঃ!' আমি ধিক্কার দিই।

'তারপরে চাব নম্বরীকে আসতে দেখা গেল। অদূরে শ্রীমতীর আবির্ভাব দেখেই ভাবলাম যে আগের থেকেই পাশ কাটাই—সময় থাকতে কেটে পড়ি—কিন্তু হায়, সে-চেষ্টা করাব আগেই—নিজেই আমি কাটা পড়লাম।'

'হায় হায়!' আমারো।

'হায় হায় বলতে! মুখপুড়ি যেন মানোযারি জাহাজের মতই ঘাড়ে পড়লো এসে। ফুটপাথ বদ্‌লাবার ফুরসৎটুকুও দিলো না!'

'দিলো না তো? দেবেই না। জানা কথা। কথার জাহাজ বয়ে আনছে যে। আগে কেবা কান করিবেক দান তারি লাগি কাড়া-কাড়ি—' আমি কবিতা দিয়ে বুঝিয়ে দিই। কার কবিতা কে জানে।

'আর, এসেই যা ফরফরানি সুরু করলো—তাব কী বলবো—'

'বলবি কী! সফরে বেরিয়েছে যে।' আমি বিস্তারিত করি—'করবেই, জানা কথা। কেননা, শাস্ত্রেই বলেছে—সফরী ফরফরায়তে।'

'ফরফর বলে ফরফর? সে আর থামে না। থামতে চায় না।

আর খালি সেই এক কথা, বেশ খাসাই আছিস দেখছি ! সেই একঘেয়ে খবর !'

'বাঁধা ফরমুলা।' অবাধে রায় দিই—আমিও।

'তখন কি করি, প্রতিশোধ নিতে হোলো আমায়—বাধ্য হয়েই। বল্লাম আমিও—তুমিই বা কম কি খাসা বাপু ? খাসীর মতন ফুলছো—দিনকের দিন !

'শুনে সে বললো, না ভাই বলিস্‌নে, তেমন আর ভালো নেই। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছে বেজায়। বলেই সে নিজের দৈহিক নানান্‌খানার যতো দুঃসংবাদ জানাতে লাগলো আমায়। দাঁত কন্‌কন্‌, চোখ টন্‌টন্‌, মাথা ঝন্‌ঝন্‌—ইত্যাদির তালিকা একে একে শুনিয়ে দিলো সব। শুনতে হোলো আমায় মুখ বুজে। যাবতীয় ফিরিস্তি শুনে···শুনে টুনে আমি বল্লাম, সর্দি হওয়া তো ভালোই। সর্দি হলে শরীর তাজা হয়। গায়ের রক্ত বাড়ে। সব গালে এসে জমে। গাল টক্‌টকে হয়, ঠোঁট টুক্‌টুকে হয়। সারা মুখ আপেলের মতন পেল্লাই হয়ে ওঠে।'

'বল্লি তুই ? ওর মুখের ওপর বল্লি ?'

'বলে দিলুম দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। শুনে ও বল্লে, তুই আমায় খুঁড়ছিস্‌ ? আজ শনিবার দিন তুই খুঁড়লি আমায় ? বলেই আঙুল কামড়ে দিলো।'

'আহাহা, দেখি দেখি।' আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি—'দেখি তোর আঙুল ? কোথায় কামড়েছে ? জাম্‌বাক্‌ লাগিয়ে দিই জায়গাটায়।'

'আমার না গো, তার নিজের আঙুল কামড়ালো।' বাৎলালো প্রিসিলা : 'আমারটা কখনো আমি কামড়াতে দিই ? আমি খুঁড়লাম কিনা ওকে, তাই। মাটি খোঁড়ে কিনা মানুষ। তাই খুঁড়লে শরীর মাটি হয়। আমার কথায় নিজের আঙুল কামড়িয়ে চলে গেল সে।'

'তাবপর মিটলো তো গোল? কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরলি তো তারপর?'

'তার অনেক—অনেক পরে। তাবপরেও আরেকজনকে আসতে দেখলাম। আরেক সহপাঠিনী—তবে এ মেয়েটা ইস্কুলেব থেকে আমাব বন্ধু। সে এসে হাঁ করতেই—করতে না করতেই—আমি হাঁক্‌ডেছি—

'তুমি কী বলতে চাও মীরা শুনি তো? আমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে আজ, এই না? কিন্তু জেনে রাখো, একথা বলেছো কি আব তোমায় আমি খুন কবে বসেছি তক্ষুনি। হ্যাঁ, ভালো চাও তো আর একটি কথাও নয়, মুখ বুজে চুপ্‌টি করে চলে যাও, হ্যাঁ। হ্যাঁ—হ্যাঁ— হ্যাচ্‌চো—

'না, সেকথা আমি বলিনি—বল্লে সে—আমি বলছিলাম কি—তোকে ভারী ভালো দেখাচ্ছে এই শাড়িটা পরে। আজকেব এটায তোকে মানিয়েছে এমন! চমৎকার!...

'শুনে—শুনতে না শুনতে—সেই দণ্ডেই যেন আমি সুস্থ হযে উঠলাম। শাড়িটাকে ভালো বলে মীরা যেন আমায় সারিযে দিলে—এক কথায়। এক মিনিটে—মিরাক্‌লের মতই। সর্দিটর্দি সব সরে গেল—ভালো হয়ে গেল সব। মাথা হাল্কা হোলো, শবীব ঝরঝরে হয়ে গেল দেখতে না দেখতে। সেই ম্যাজম্যাজানি গেল, ফের আমার মেজাজ ফিরে পেলাম। গা হাত পা যা টনটন্ করছিলো তা যেন চোখের পলকে পালকের মতন হাল্‌কা হযে গেল, তুলোব মত তুলতুল কবতে লাগলো। এক টন থেকে একেবারে এক ছটাকে নেমে এলাম আমি.....।'

'ইস্, বেজায় বলছিস যে। ভাবী তোব কথার ছটা দেখছি।' শুনে শুনে এমন ঈর্ষা হয় আমার।

'কী আনন্দ যে হোলো আমার সে তুমি বুঝবে না মেজমামা...'

'—বুঝেছিরে বুঝেছি। শারীব-প্রশস্তি শুনে এমন স্বস্তি পেলি যে, তোর শবীব সেরে গেল।' আমার সমঝ্‌দাবি ব্যক্ত করি—'অসুখ আর তার সব উপসর্গ দূর হয়ে সমস্ত জ্বালা তোর আরাম হয়ে গেল। এই তো বলছিস?'

'হ্যাঁ, এমন আবাম পেলাম মেজমামা, কী বলবো। আমাব চোখ চক্‌চক্ করতে লাগলো, গাল টক্‌টক্ করতে লাগলো। একেবাবে তাজা আপেল—যা শুধু শেখ আবদুল্লাই দেখতে পান—পেলাম যেন আমার গালে।... ' বলেই সে শুধ্‌রে নেয়—'মানে, আমাব গালেব ভেতরে নয়, ওপরেই।'

মীরার MIRROR এ নিজেকে দেখার পর

'মানে, তোব ঐ পেলব গাল আপেলব হযে উঠলো। এই তো?' আমি বলি—'এই তো বলছিস্? শুনি তাবপর?'

'তারপব? মীবাকে আমি আদব না কবে পারলাম না। ওর নরম গালে আমার গাল দিয়ে একটুখানি, তোমার ভাষায বলতে গেলে কী বলবো? কিছুক্ষণ—গালাগালিব পব আমি বল্লাম—'চ ভাই মীরা, তোকে কিছু খাওযাই।' বলে ওকে ধবে তক্ষুনি কফি-হাউসে নিয়ে গেলাম। টেনে হিঁচড়ে—ওব কোনো ওজোর না শুনে—জোর করেই একবকম।'

বারো

প্রবীণ উকীল নবীন মক্কেলের প্রতি নজর দিলেন। মেয়েটির আরক্ত মুখ, স্ফুরিত অধর, উত্তেজিত মেজাজ।

অর্ধচন্দ্রাকার টেবিলটার ওধারটায় বসেছিলো সে, কিন্তু যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যাক, দেখলে সুশ্রী বলেই বোধ হয়। যেমন উত্তম, তেমনি উত্তেজিত।

সুশ্রীতার দিক দিয়ে হয়তো বা একটু উত্তেজকও বলা যায়।

'মিস্টার পাকড়াশী, আপনি আমার কথাটা মন দিয়ে শুনছেন না!'

উকীলের দৃষ্টিভঙ্গীর মাঝখানে মক্কেলের ভ্রূভঙ্গি দেখা দেয়।

'অ্যা···হ্যাঁ···শুনছি বই কি।···হ্যাঁ, কী নাম বল্লেন যেন আপনার?'

'এনা—এনাক্ষী—কুমারী এনাক্ষী সেন।'

'শ্রীমতী এনাক্ষী দেবী, এপর্যন্ত যদ্দূর বোঝা গেল, তাতে পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটেকে আপনি আদালতে সোপরদ্দ করতে চান, এই তো? আপনার কেস্ তেমন পোক্ত কিনা তাই জানতেই আমার কাছে আপনি এসেছেন?'

'হ্যাঁ। লোকটা আস্ত একটা জানোয়ার। আমার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। ও আর ওর কুকুর দুজনেই। এমন বিচ্ছিরি লোক আর হয় না·····' বলতে বলতে ফুলের মত ফুটন্ত মেয়েটি যেন ফুটন্ত জলের মতন গরম হয়ে উঠলো—'জেলই হচ্ছে ওর উপযুক্ত জায়গা। ওকে আমি জেলে পুরতে চাই। তার জন্যে যে-দশা হয়েছে আমার তার—তার আর কী বলবো·····তা বলা যায় না! বদমাইসটাকে ঐ ফ্ল্যাট থেকে তাড়াতে না পারলে·····'

আপনি জানেন না

ফুটফুটে মক্কেলটির কথাগুলিও যেন ফুটফুটে—ছুঁচের মতই হুবহু। প্রৌঢ় উকীল নিজেকে বেশ বিদ্ধবোধ করেন। নারীর শ্লীলতা-হানি, না অনধিকার প্রবেশ কোন্ দায়ে আদায় করবেন লোকটাকে, দায়ের করবেন মামলা, ভাবেন তিনি খানিক। মেয়েটির কৌমার্য কিম্বা সৌকুমার্য কী নিয়ে টানাটানি হয়েছে ঠাওর পান না ঠিক ঠিক।

'দেখুন মিস্ সেন, বলা না গেলেও, বলতে একটু বাধ-বাধ ঠেকলেও সব-কিছুই খুলে বলতে হবে আপনাকে। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাই— একটুও গোপন না করে। নইলে মামলাটার কিনারা আমরা পাব না। এ কেসে কিভাবে আমাদের এগুতে হবে তার আন্দাজ পাওয়া শক্ত হবে। আচ্ছা, এক মিনিট·····' এই বলে তিনি নোট বই আর পেনসিল বার করেন—'আমি একটা করে জিগেস করি, করে যাই, আপনি তার জবাব দিন। আপনি কি·····, আই মীন, আপনার ওপর বিশেষ অত্যাচার হয়েছে এই কথাই আপনি বলতে চান তো?'

জানোয়ারী জানাশোনা

'অত্যাচার! অত্যাচার আপনি কাকে বলেন?' মেয়েটির শুকনো হাসি দেখা দেয়—'যদি আমার বন্দুক থাকতো তাহলে আমি—'

আপনি কী হারাইতেছেন

'ঠিক কথা—ঠিক কথাই।' বন্দুকের কথাটা পাকড়াশীমশায়ের বিশেষ ভালো লাগে না, শুনে তিনি মনে দুঃখ পান। যতই আধুনিকা হোক না, বাঙালী মেয়ের হাতে বন্দুক যেন বেমানান। ঝাঁসির রানীর হাতে অসি শোভা পেত বটে, কিন্তু বাঙালিনীর অতোখানি ঝাঁস—ভাবতেও যেন কেমন! রাজপুত-ললনারা বর্শা হাতে রণাঙ্গনে ছুটতেন শোনা যায়, কিন্তু আমাদের মেয়ের তা হাতে করার দরকার হয় না, চোখে চোখেই থাকে। এবং ছোটাছুটি যা করবার তা অপর পক্ষই করে। আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—তার রেষারেষিতে কাড়াকাড়ি করে এসে অবলীলায় মারা পড়ে তারা। বর্শার ঘায় ফর্সা হয় আপনারাই। নিজগুণেই।

আর, চোখের এই বর্শাই কম কি? কখনো বা তা বর্ষারূপে দেখা দিলেও তার বেঁধবার ক্ষমতা কমে না একটুও। বর্ষাবিদ্ধ হয়ে কতলোক যে গহনবনে—গহনার দোকানে গিয়ে দেহরক্ষা করেছে! আর যদিই বা তা বর্শাটর্শা না হয়ে নিতান্তই বঁড়শী হয়েই দেখা দেয় (ছিপছিপে মেয়েদের চোখেই) তাও তো প্রাণ নিয়েই টানাটানি! একেবারে গলায় এসে গাঁথে। (স্বয়ম্বরাদের সে-ই তো জয়গাথা!) তার ওপরে বিধাতা নিজের মুক্ত অসি তাদের মুখের খাপে ভরে দিয়েছেন (তাকে মুক্তর মত দাঁত বলেন নাকি কেউ কেউ!) দয়া করে একটু হাঁ করলেই হোলো। কথার মুক্তধারা বুঝি সেই অসির ধারের থেকেই বহমান (কানের চামড়ার যে-ঢাল তার ধারণাস্থল) কিন্তু সে-কথা এখানে ধরা হচ্ছে না—বলা হচ্ছে হাঁয়ের সঙ্গে জড়ানো যে অসি—সেই হাসির কথাই। হাঁ প্লাস্ অসি—হাঁ মশাই—চুপিয়ে চুপিয়ে কাটতে আর চুপি চুপি কাটতে তার মতন অকাট্য আর নেই। কাজ হাসিল করার অমন হাতিয়ার আর হয় না। ধারালো চোখের বঁড়শি—মুখের

সেই অসির ধারে, ধারে কাছে যে গেছে (নিতান্ত বষিয়সীর না হলে) সে খতম্। সে বেচারী আর অক্ষত নয় !

'ঠিক কথাই।' বলেন পাকড়াশী—নিজের চিন্তারাশির জটিল পাক থেকে ছাড়া পেয়ে—'কিন্তু বন্দুকের কথা কেন? আদত ব্যাপারটা ঘটলো কখন এবং কিভাবে ঘটলো? সেই কথাই বলুন। যেমন যেমনটি ঘটেছে, যথাযথভাবে বলে যান।'

'যথাযথই বলবো, শুনুন আপনি সব কথা। একই বাড়িতে আমাদের বাস—পাশাপাশি—ঐ লোকটার ফ্ল্যাট আমার ফ্ল্যাটের একেবারে গা-লাগা। মাঝখানে খালি এক ফালি বারান্দা। বারান্দাটা একটা রেলিং দিয়ে দুভাগ করা, তার এধারে থাকি আমি একলাটি, আর ওধারে সেই জানোয়ারটা·····'

'একলাটি? একলাটি কেন?' জিগেস করেন উকীল: 'আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই এখানে? কী করেন আপনি কলকাতায়?'

'কাজ করি। চাকরি করি সরকারি আপিসে। বাপ মা সব দেশে আছেন আমার—মাস মাস টাকা পাঠাতে হয় সেখানে।'

'বুঝেচি। কিন্তু এই শহর-জায়গায় একেবারে একলাটি থাকা যেন···' মিঃ পাকড়াশীর যেন কেমন লাগে। ব্যাপারটা ঠিকমত পাকড়াতে পারেন না।

'একেবারে একলাটি নয়, ঝি থাকে আমার সঙ্গে। তবে সব সময় তো থাকতে পারে না, কাজে কর্মে বেরুতেই হয় তাকে। তবে রাত্তিরে সে থাকেই আমার কাছে।'

'আর পাশের ফ্ল্যাটের সেই লোকটা? সেও কি একক, না, সে সপরিবারে বাস করে?'

'না, সেও একলা থাকে। বে-থা করেনি, যদ্দূর বিচ্ছিরি হতে হয়—অমন বদ্‌লোককে কে বিয়ে করবে? হতচ্ছাড়াদের কি কেউ মেয়ে দিতে চায়?'

'যাক্। এখন আপনার এই ঘটনায় আসা যাক্। এটা ঘটলো কবে? কখন?'

'কাল। কাল বিকেলে। কাল শনিবার আপিস থেকে ফেরবার পর। আমার ঝি তখন বাসায় ছিল না। আমি বাথরুমে চান্ করছি এমন সময়ে—বলেছি না আমাদের দুই ফ্ল্যাটের মাঝে এক ফালি বারান্দা আছে? ছোট্ট একটুখানি রেলিং-এর মতন রয়েছে, বলিনি? কিন্তু সে আর এমন কি বাধা? তাতে কি কিছু আটকায়? অমন জানোয়ারের পক্ষে তা ডিঙিয়ে আসা·····ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তেই সে আসতে পারে—'

'তা বটে।·····তারপর কী হোলো? আপনি বাথরুমে চান করছিলেন এমন সময়ে—?'

'বাথরুমেই আওয়াজটা পেলুম—আমার শোবার ঘরের দরজা ঠেলে কে যেন ঢুকলো মনে হোলো। হাওয়ায় খুলে গেছে ভেবে বড়ো তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে চানের ঘর থেকে বেরুলাম। কি জানি, শোবার ঘরের ছিট্‌কিনিটা আঁটতে ভুলে গেছি হয়তো। খিলটা লাগিয়ে আসি, এই মনে করে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেলাম—। দেখতে পেলাম আমার ঘরের দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে সেই মূর্তিমান—!'

'বুঝলাম। তারপর? তারপর কী হোলো?'

'দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলাম মিনিটখানেক। তারপর

আমি গর্জে উঠলাম—'যাও, চলে যাও এখান থেকে।' কিন্তু আমার গর্জনে সে কর্ণপাত করলো না—'

'করবেই না, জানা কথা।' পাকড়াশী জানান—'পশুত্বের স্তরে নামলে তখন কি কোনো জ্ঞানগম্যি থাকে ? থাকে না বলেই তো এই—এই যতো আইন-কানুন,—পুলিশ-আদালত—এসব তো তার জন্যেই। নইলে আমাদের কারবার গুটোতে হোতো কবে।'

'মিস্টার পাকড়াশী, বলবো কি, কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি দেখলাম যে তার চোখে—তার চোখেমুখে—এমন বিচ্ছিরি যে—আর এত ভয় করতে লাগলো আমার! আমার চানের তোয়ালেটা আরো ভালো করে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিলাম—'

তাছাড়া আর কী করবার ছিলো তখন—ভেবে ছাখেন মিস্টার পাকড়াশী। যথোচিত সজ্জাভাবের ওপরে যদি আবার যারপরনাই লজ্জা-ভাব দেখা দেয় তখন বারো হাত শাড়ির কাজ চার হাত তোয়ালে দিয়েই সারতে হয়—খাটোর জন্যে খাটুনি একটু বাড়লেও। বাধ্য হয়েই। অগত্যা।

'ভয়ের কথাই বই কি ? নির্জন ঘরে একলা আপনি অসহায়া রমণী—'

'আর অমন একটা বিচ্ছিরি—কী বলবো ? বিভীষিকা আমার সামনে। সেই ক্ষুধিতদৃষ্টি নিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে। তারপরে আবার দাঁত বার করলো জানোয়ারটা।'

'হাসতে লাগলো তার ওপর ?' পাকড়াশী একটু অবাক হন। —'বলেন কি আপনি ?'

'হাসি ? তা হয়তো হাসিই হবে। ঐরকমই ওদের হাসি হয়তো। কিন্তু সে ভারী ভয়ঙ্কর হাসি। হাসি—কিম্বা দাঁত বার করা, কিম্বা শুদ্ধ

ভাষায়, বদনব্যাদান—যাই বলুন—তা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার গায়ের তোয়ালেটা খুলে ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলাম।'

'আর আপনি—? মানে, আপনার গায়—?'

'কিছুই থাকলো না; একেবারে—একেবারে—' কী ভাষায় সেই অভাব ব্যক্ত করা যায় মেয়েটি ভাবে—

'বুঝেচি·····তারপর?' সে যে নাগা-রমণীর অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তা তিনি বুঝতে পারেন, বুঝে আর আগান না। তাহলেও, জানানারা রহস্যময়ী! এইজন্যেই, জানোয়ারের জায়গায় না থাকলেও জানবার জায়গায় কোনো ফাঁক রাখতে তিনি রাজি নন্।

'তখনো—তখনো আমি চেঁচাচ্ছি—'দূর হও আমার সামনে থেকে', কিন্তু শুনলে তো! তখনো তার নড়বার নামটি নেই।'

'তখনো—তখনো সে লুব্ধ নেত্রে—মানে, কী বলে গিয়ে—তার সেই লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে?'

'হ্যাঁ, সমানে। তখনো সেই চাউনি আর সেইরকম—যদি তাকে আপনি হাসিই বলতে চান—'

'না, তা বলতে চাইনে। তাকে মুখভঙ্গিই বলা উচিত, দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মুখভঙ্গি। কিন্তু তার পর? আপনার সেই তোয়ালেটা? যেটা ওকে তাক্ করে ছুঁড়েছিলেন?'

'গায় লাগেনি তার। লাফিয়ে সরে গিয়ে সে পাশ কাটিয়ে নিয়েছিলো।'

'বটে? খুব হুঁশিয়ার তো!'

'বিলক্ষণ। কেমন লোকের—সেটা তো দেখতে হবে।'

আপনি জানেন না !

'ভীষণ লোকের—মানে, বেশ শক্ত পাল্লায় যে পড়েছিলেন, তা আমি বুঝতে পারছি।'

'ভীষণ বলে ভীষণ। তখন আমি আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় না পেয়ে জলের কুঁজোটা তুলে তার দিকে ছুঁড়লাম—।'

'লাগলো তাকে ?'

'একদম্ না। ফের সে সামলে নিলো। শুধু মেজেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল কুঁজোটা। আর—আর তারপরই সে তাড়া করলো আমায়—'

'তাড়া করলো—তার মানে ?'

'মানে, এগিয়ে এল সে—পাক্‌ড়াতে এলো আমাকে—'

'আর আপনি ?'

'আমি প্রাণের দায়ে এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগলাম। এঘর থেকে ওঘরে ছুটলাম, ওঘর থেকে সে-ঘরে—আর সে লেগে রইলো আমার পিছু পিছু—'

'তেমনি দাঁত বার করে আর তার ঐ জঘন্য দৃষ্টি নিয়ে ?'

'জঘন্য বলে জঘন্য !'

'নিশ্চয় তখন আপনি চেঁচাতে শুরু করলেন ? আমায় বাঁচাও বলে চীৎকার ছাড়লেন তখন ?'

'নিশ্চয়। কিন্তু শুনছে কে ? ছোট্ট বাড়িটায় ঐ দুখানাই মোটে ফ্ল্যাট্। আর, কলকাতার লোকেরা পাড়াপড়শীর কোনো খবর নেয় ? তাছাড়া, আমার গলা তখন ভয়ে বুজে এসেছে—জিভ আড়ষ্ট—আওয়াজও বেরুচ্ছে না ভালো করে—সেই ক্ষীণস্বর কারো কানে পৌঁছলে তো ? এমন সময়ে—'

'এমন সময়ে—?' উকীলের কণ্ঠস্বরও উত্তেজনায় যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। 'এমন সময়ে কী বুদ্ধি করে এক দৌড়ে আমি ঝিয়ের ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে ঢুকে পড়লাম হঠাৎ। সেটা ফের আমাদের রান্নাঘরও। সেখানে ঢুকেই দরজায় খিল্ এঁটে দিলাম ভেতর থেকে।'

'এক ছুটে'র অপূর্ব মুহূর্ত

হতাশার একটা পাতলা ছায়া যেন পাকড়াশীর চোখের উপর দিয়ে খেলে গেল। একটু ক্ষুণ্ণকণ্ঠেই তিনি যেন শুধালেন—'তারপর···? তারপর কী হোলো, মিস্ সেন?'

'ভয়ে খানিকক্ষণ আমি বিমূঢ় হয়ে রইলাম। দরজার এদিকে আমি, ওদিকে ও। এইভাবে এখানে আটক থাকতে হবে আমায়—এই অবস্থায়—কতোক্ষণ কে জানে! কতো করে চলে যেতে বল্লাম ওকে। গালমন্দ দিতে বাকি রাখলাম না কিছু। যা মুখে এলো বল্লাম—ড্যাম্ শুয়োর পাজি গাধা ইস্টুপিট রাস্কেল্ নন্সেন্স্ উল্লুক বাঁদর—যা মনে এলো তাই! কিন্তু তবু সে তেমনি খাড়া রইলো সেখানে। আমার অপেক্ষায়। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আমি স্পষ্ট শুনছিলাম। ঠিক এই সময়ে বাইরের দরজায় কড়া-নাড়ার আওয়াজ হোলো। আমার এক বন্ধুর গলার সাড়া পাওয়া গেল। শুনলাম আমরা দুজনেই —সে-ও, আমিও। শুনেই সে বেশ ভড়কে গেল, ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম। সুড়সুড় করে সে পালিয়ে গেল তারপর।

আমার শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে গলে বারান্দার মধ্যিখানের রেলিং টপ্‌কে চলে গেল তার নিজের ফ্ল্যাটে।'

'তারপর ?'

'তারপর আমি এক ছুটে বেরিয়ে আমার বন্ধুকে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম—'

'আর— আপনার গায়ে ?' পাকড়াশীর চোখমুখ একটু যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবার। আবার।

'গায়ে ? গায়ে আমার কিছুই ছিল না। গায়ে যে কিছুই নেই সেকথা খেয়ালই ছিল না আমার। যা প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলছিলো তাতে—' এনাক্ষী এইটুকু বলেই থামে।

'তা বটে।' ঘাড় নাড়েন পাকড়াশী—'তা আপনার এই বন্ধুটি ? এই ভদ্রলোকটি ?'

নাগা রমণী আবার হয়তো আরেক নাগের পাল্লায় পড়লো,— আবার হয়তো আরেক তাড়নার পালা এলো তার, তাঁর আশঙ্কা হয়। নতুন সংস্করণে আবার বুঝি অন্য ছোবলাৎকার আসন্ন, তিনি ভাবেন।

কিন্তু এই ধরণীর নাগমাত্রই কিছু বিষাক্ত নয়, সন্দেশের মতন সুমিষ্ট নাগও রয়েছে। একই র-মেটিরিয়ালে শুরু হয়ে থাকলেও রাবণ আর রাম এক চীজ নন্। আদিতে এক হলেও ইত্যাদিতে আলাদা। গোড়ায় যাই থাক্, গড়ায় প্রভেদ। এবং গড়ায়ও ভিন্নপথে।

হ্যাঁ, ভিন্ন পথেই তাঁদের আগানো। একের তাড়ন বিপদের মধ্যে, অপরের তারণ বিপদের থেকে—র-কারেরো ঈষৎ ইতরবিশেষ আছে বই কি! এক নাগের মুখ থেকে যেমন পালাবার ফিকির তেমনি

আরেক নাগের মুখে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—যদিও গভীর-ভাবে তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা একই। দুজনেরই সাধ করা আর স্বাদ করা। একজন তাড়িয়ে যায়, সাধ করলেও সেটা হয় তার অসাধ্য সাধন—আরেকজনের—তারো হচ্ছে স্বাদের সাধনা—তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া। তবে কথা এই, কার্যক্রম আর ধরণ-ধারণ অভিন্ন হলেও দুষ্মনের বেলায় যেটা দুষ্য ব্যাপার, দুষ্যন্তের বেলায় সেটা অদোষের—পক্ষে সেটাই দস্তুর।

'ইনি কোনো ভদ্রলোক নন্।' প্রকাশ করে এনাক্ষী। 'আমার এক মেয়ে-বন্ধু।'

'ওঃ, মেয়ে-বন্ধু!' ছোট্ট একটু নিশ্বাস পড়লো পাকড়াশীর। নাগ নয়, নাগিনী! এই নাগিনীরা এখনো যে দিগ্বিদিকে বিষাক্ত নিশ্বাস ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের এত করে বলার পরেও নিরস্ত হয়নি—এটা তাঁর ভারী খারাপ লাগে। অসময়ে অকুস্থলে অযথাভাবে এসে দেখা দিয়ে— ভালো ভালো দুর্যোগগুলো এভাবে মাটি করে দেয়া, সত্যিই এটা—এতটা ভালো নয়। রীতিমতই অসহনীয়।

'আমার বন্ধুকে সব কথা খুলে বল্লাম।' এনাক্ষী বলে: 'শুনে টুনে সে বল্লে—এখানে বাস করতে হলে পাশের ফ্ল্যাটের লোকটার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। পুলিশে খবর দেয়াই উচিত। কিন্তু তার আগে তুমি একজন ভালো উকিলের পরামর্শ নাও। তাই আমি তার কথায় আপনার কাছে এসেছি।'

'ভালোই করেছেন এসে, ঠিক কথাই বলেছেন তিনি।'

পাকড়াশী এবার একটু খুশিই হন নাগিনীর ওপর। না, ততটা খারাপ নয়। নাগিনীর সম্মুখভাগ বিষ-দৃশ হলেও, শেষের দিকটা তো

গিনীই। আর, গিনী আসলে সোনাই। সুবর্ণ-সুযোগই বলতে হয়। এই মামলার ফয়সলায় ফিসের হারটা কী পরিমাণ মোটা হতে পারে তার সোনালী হিসেবটা মনে মনে তিনি ফিসফিস করেন।

—'এখন আসল কথায় আসা যাক। মামলার গোড়ার কথাই হচ্ছে সাক্ষী সাবুদ।' পাকড়াশী গলাটা চাঁছাছোলা করেন—'এখন, সাক্ষী বলতে এখানে যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে আপনার কথা। তার কথার বিরুদ্ধে আপনার কথা। ওথ্ এগেন্স্ট্ ওথ্।'

'কিন্তু সে তো অস্বীকার করছে না।'

'করছে না?'

'মোটেই না। বরং উল্টে সে বেশ গর্বিতই। তার পরেই তো গেলাম আমরা তার কাছে—আমি আর আমার বন্ধু—দুজনে মিলে বোঝাপড়া করতে গেলাম। ভাবলাম তাকে যদি বেশ করে কড়কে দেয়া যায়—'

'এঁ হেঁ হেঁ—' পাকড়াশীকে আবার সাফ করতে হয় গলাটা—'বেশ করে'—মানে, বেশবাস করেই বেরুলেন তো?'

'হ্যাঁ, যথারীতি যেমন সাজসজ্জা করে বেরুই—গিয়ে তার ফ্ল্যাটের কড়া নাড়তেই সে বেরিয়ে এলো। নিজেই এসে দরজা খুলে দিলে। আমি যখন বল্লাম যে, এর জন্যে আমি পুলিশ কেস করবো, জানাতে যাচ্ছি থানায়, শুনে সে হাসতে লাগলো হি-হি করে।'

'সবুর করুন একটু।···লোকটা কি আপনার বন্ধুর সামনে সব কথা—সমস্ত ঘটনা মেনে নিলে?'

'সব। সমস্ত। তার ধারণায় এটা যেন একটা হাসির ব্যাপার! মজা ছাড়া কিছু নয়। মস্ত এক পরিহাস যেন!'

'বটে? তাহলে তো এ কেস বেশ জোরালোই। পরিষ্কাব মামলা আমাদের।' এই মজা পাওযাটাই যে ওকে মজাবে, আরো মজা পাওয়াবে, সেটা বেশ সোজাই তিনি ছাখেন।

আসামী-হাঁসিল্।

'তাহলে নালিশ কবে জব্দ করতেপারবো লোকটাকে?'

'নিশ্চয়। আপনার বন্ধুর সাক্ষ্য যখন আমরা পাচ্ছি, তাঁর মুখেব ওপর যখন সেসব মেনে নিয়েছে, মানে, মেনে নিয়েই হেসে উডিয়ে দিযেছে কথাটা, তখন তার ওপবে—না, তাঁর ওপবে আব কোনো কথা নেই। আর কিছু নয়। আপনি স্বচ্ছন্দে ক্ষতিপূরণের দাবী করতে পারেন। মোটা রকমের খেসারৎ পাবেন। নির্ঘাত।'

'খেসারৎ?' মেযেটির চোখে যেন ঝিলিক খ্যালে—'খেসাবৎ কে চায়? আমি চাচ্ছি ওকে গুলি করে মাবতে—ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চাচ্ছি আমি—যেন আর না সে কোনোদিন আমায় ভোগাতে পারে।'

পাকডাশী চশমাটা একটু নামান্, তাব ডাঁটির ওপর দিয়ে তাকান মেয়েটির দিকে। না, ডাঁট আছে বটে মেযেটার। উচ্চাভিলাষও

কম নয় বড়ো। মেয়েটি কেবল যে মরীয়া তাই না, মোড়ে গিয়েও থামবার নয়। পথের শেষপর্যন্ত যাবে। নারীর এই মারমূর্তি—এই মহামারীরূপ তাঁর চোখে বুঝি এই প্রথম।

'এনাক্ষী দেবী, যা আপনি বলেছেন আমায়—তাই, শুধু তাই-ই যদি হয়ে থাকে, তার বেশি আর কিছু না ঘটে থাকে—তাহলে আইনের আমার যদ্দূর ধারণা, তাতে বলতে পারি, খেসারতের বেশি আর কিছু আপনি দাবী করতে পারেন না। যেহেতু একটা লোক—তা সে যত বদ্‌ই হোক—আপনাকে শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, শুধু সেই তাড়নার কারণেই সে বধ্য হতে পারে না। এজন্য এদেশের কোনো আদালতই তাকে চরম দণ্ড দিতে রাজী হবে না। মনে আপনার যত বড়ই চোট লাগুক, খালি এইটুকুর জন্যে ফাঁসি হতে পারে না লোকটার।'

'লোকটার?' হোঁচোট খায় এনাক্ষী—'লোকটাকে ফাঁসি দিতে চাইছে কে? তাকে কেন মশাই, সে তো কিছু করেনি আমার—তার কুকুরটাকেই গুলি করতে বলছি তো?'

তেরো

গত শত অব্দে তো বটেই, এমন কি সেদিন অব্দি নরনারীকে হাত করার পথ ছিল পণ-প্রথা। সেখানে এখন বিজ্ঞাপন-প্রথা। এই কথাই আমি নানা কথায় বোঝাচ্ছিলাম ভদ্রলোককে।

খবরের কাগজের থেকে সুরু করে কোথায় নেই বিজ্ঞাপন? সিনেমা-হলে, স্টেশন-স্টলে, দেওয়ালের গায়—কোন্ জায়গায় না? এমন কি, রাত্তিরে আলোর দেওয়ালিতেও। উজ্জ্বল অক্ষরে নিজের মহিমায় জ্বল্ জ্বল্ করছে।

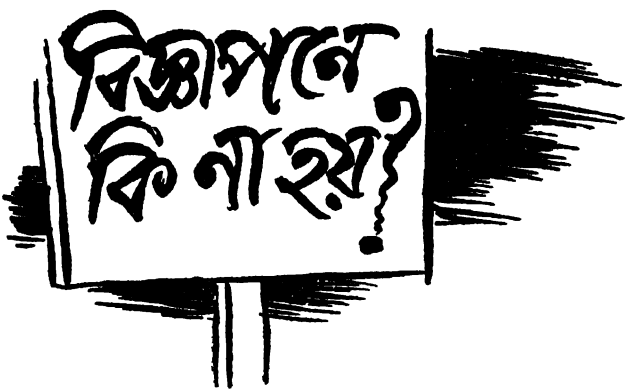

আকাশবাণী।

বেশি কী বলব, বিজ্ঞাপনেরো বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি। অবিজ্ঞাপিতকে বিজ্ঞাপন দিতে প্ররোচিত করে 'বিজ্ঞাপনে কী না হয়' দিব্য প্রেরণার এমন বার্তাও দেবাক্ষরে আমার চোখে পড়েছে।

'পাঁজির মধ্যেও বিজ্ঞাপনের পাঁজা।'—বিজ্ঞাপন-পঞ্জী আরো একটু বিস্তৃত করতে হোলো আমায়—'পঞ্জিকার গর্ভেও পুঞ্জীভূত পাবেন। দিনক্ষণ দেখতে গিয়েও রক্ষে নেই।'

'তা বটে। পাঁজিরা আমাদেরও ছাড়ে না, দিতেই হয় বিজ্ঞাপন।' কবুল করেন তাঁকে।

পাঁজির পাঁজারা তাঁকেও ছাড়েনি, ক্ষুর-ওয়ালার ওপরেও ক্ষৌরকর্ম করে গেছে ভাবলে অবাক্ হতে হয়।

'দেবেন বই কি। সাবেক পথে তো দেবেনই, তাছাড়াও নতুন নতুন পন্থা দেখতে হবে। নানারকম মাধ্যম—অনেক রকমের 'মিডিয়াম্' দরকার। আর, নতুন ধারাই হচ্ছে উত্তম-মাধ্যম, সর্বদা নতুনতরো কায়দাই আসল। এমনটা চাই যাতে চট্ করে সবার নজর পড়ে, পড়লেই চমক্ লাগে, নজরে লাগলেই মনে লাগে। এই যেমন ধরুন—'

আমার আন্‌কোরা ধারণাটা ওঁর সম্মুখে তুলে ধরলাম।

বিজ্ঞাপন-ব্যাপারে আমি যে একজন বিজ্ঞ লোক, কোন্ এক বাল্‌তির ব্যাপারীর কাছে তার খবর পেয়ে আমার কাছে তিনি এসেছিলেন। এসেই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এক লাইনের ব্যাবসা না হলেও তাঁর সঙ্গে বাল্‌তিওয়ালার কেমন যেন আড়াআড়ি, এই ধারণাটাই তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল এতদিন, সে-ব্যক্তির এই নতুন ভাবের অভিব্যক্তি তাঁর কাছে অভাবনীয় লাগে।

আমার কাছেও। আমারো এটা ভাবনাতীত। চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা যায় কি না কে জানে, তবে যদ্দূর মনে পড়ে, একদা, আমার বিজ্ঞাপনের কৌশলে বাল্‌তিতেই তাঁকে আমি ডুবিয়েছিলাম।

সে-ই তিনি এঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। নিতান্ত বাল(তি)-সুলভ চাপল্যের বশেই, আমার মনে হয়।

যাক্ গে, ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই·····

আগন্তুক এ-ভদ্রলোকের ক্ষুরের কারবার। এস্ ডি ওয়াস্তা অ্যাণ্ড কোম্পানীর রেজারের নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনে থাকবেন। এঁদের ক্ষুরের গুণ-গরিমা হাতে-গালে পরীক্ষা করে টের না পেলেও, গাল-গল্পে আপনার কানে এসেছে আলবৎ।

রেজারের জারিজুরি এঁদের। উক্ত রেজারের যে জুড়ি নেই এই কথাটা আরো ভালো করে জারি করতে হলে বিজ্ঞাপন-কারুর যদি কিছু কারিকুরি করার থাকে, তার জন্যই আমার কাছে তাঁর আসা।

সোজা রাস্তায় আনা

তাঁর আশা ব্যর্থ করবো, বলা বাহুল্য, এত বড়ো আনাড়ি আমি না। ক্ষুরের যতই ধার থাকুক্, ক্ষুরওয়ালা পায়া-ভারী কেউ আমার মতো ধারালো কারো ধারে-কাছে এলে—

এসে আমার কলিং-বেল্ টিপলে—এই বেল-তলায় এলে—ন্যাড়া হয়ে তাকে ফিরতে হবে।

যা হবার তাই হোলো। এ যুগের বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞানের কিছুই তাঁর

অবিদিত রইলো না। নানা ধার থেকে তার নানান্ ধারা সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত—খুঁটিযে খুঁটিয়ে আমি জানালাম।

সবিশেষ জানিয়ে অবশেষে ওঁকে আমি বাস্তায় আনলাম। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের রাস্তায।

'রাস্তাটা ভাবী বাঁকাচোরা।'

'সেই তো আরো সুবিধে।' বাতলাই আমি—'ওর বাঁকে বাঁকে যদি আপনার ক্ষুরের মহিমা প্রচারিত থাকে, আব, যাবার ফাঁকে ফাঁকে পথচারীদের নজরে পড়ে, তাহলে·····তাহলে ভেবে দেখুন মিঃ ওয়াস্তা, কতো হাজার হাজার মোটরগাড়িই না রোজ রোজ—মিনিটে মিনিটে—ঐ রাস্তা দিযে যাচ্ছে। যাচ্ছে আসছে। আর সেই সব গাড়িতে—গাড়িতে গাড়িতে ভদ্রলোক এবং ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে দাড়ি। সে-দাড়ি পরের কামানোই হোক, আর স্বোপার্জিতই হোক—ক্ষুরের দরকার সবার। আব গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের লম্বা পাড়িতে পথচল্‌তি খালি যদি এই একটি ক্ষুরেব কথাই সবার চোখে পড়ে—নানান্ দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে—তাহলে ভেবে দেখুন, আমাদের আর কিসের ওয়াস্তা ?'

মিস্টার এস ডি ওয়াস্তা ভেবে ছাখেন। আমাকে ছাখেন একবার। তাবপর আমাকে দেখে আরেকবার ভাবেন। ভাবিত হয়ে ফের আমাব দিকে তাকান্ এক-নজর! সেটা তাঁর নেকনজর বলেই আমার মনে হয়।

আমার প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন। আমার ছক্ এবং নক্‌সা-সমেত। যাবার আগে তাঁদের খান্ দুই ক্ষুব দিযে গেলেন আমায়। তাঁর উপহারস্বরূপ। ওগুলি নিজের গালে বুলিয়ে বিজ্ঞাপনের আরো কিছু চমৎকার আইডিয়া যদি আমার নাগালে আসে।

এলোও বটে! গাল ফুলে তালগাছ হয়ে উঠলো—একবার কামিযেই। এক টানেই—একটাতেই (দুখানাব ধার পরীক্ষাব ফুরসৎ পেলাম না আর)। ডাক্তার ডাকিয়ে টিন্‌চার আইডিন্ দিন চার লাগাবার পর সারলো তারপর। কিন্তু সেকথা তো বিজ্ঞাপন দিয়ে জাহির করবার নয়? ছাপবাব কথা নয়—চাপবার কথাই।

গালের জায়গায় তাল।

সত্যি বলতে, ক্ষুরের চোটে এমন শাস্তি জীবনে আমি পাইনি। নিজের গালে চিড খাওয়া—নিজের হাতে, নিজেই চাড করে আবার! দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে মাব খাওযার এমন দণ্ড পুলিস-ফাঁড়ির বাইরে আছে বলে আমার জানা ছিল না। এর থেকে বিজ্ঞাপনের যে প্রেরণা পেলাম, তা বেশ কিনা জানিনে, তবে এককথায় পেশ করা যায। এমন ক্ষুরের চড যে খেয়েছে, সেই চরম দণ্ডের আসামীর ভাষায় বলতে গেলে তা হচ্ছে—তোমার ক্ষুবে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!

যাক, দাড়ি না কামালে কী হয়, টাকা কামানো নিয়ে কথা!

আপনি জানেন না !

অনেকের মাথায় ক্ষুর বোলাতে পারলেই সেটা হয়। আর, বিজ্ঞাপন দিয়ে না 'বোলালে' মাথা নিয়ে তারা এগুবে কেন ?

অতএব, বিজ্ঞাপনের বোল্‌বোলাও ছাড়া হোলো—ফলাও করা হোলো—আহেলি নতুন কায়দায়—শেরসাহের রাস্তার ধারে ধারে।

দিল্লী পর্যন্ত চললো এই দিল্‌লগি। শেরসাহী রাস্তার দু'ধারে সেরা সাহিত্য। 'হনৌজ দিল্লি দূর্ অস্‌ত্‌।' দূর পাল্লার দু'ধারই ক্ষুরবার্তায় সমান দুরস্ত হোলো।

অবশেষে, মিস্টার এস্ ডি ওয়াস্তাকে নিয়ে বেরুলেম আমি একদিন। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের রাস্তা ধরলাম—আমাদের বিজ্ঞাপনের ওয়াস্তায়। মোটর হাঁকিয়ে চল্লেন তিনিই।

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা, দুরত্যয়া দুর্গমং পথস্তৎ—' ভদ্রলোকের পাশে বসে আমার ক্ষৌরকারু দেখাতে দেখাতে চলেছি—

'এইবার! এবার একটু আস্তে। আস্তে আস্তে চালান্ এখন থেকে, এর পর থেকেই দেখবেন……' আমি তাঁকে নজর দিতে বলি।

গাড়ির গতি একটুখানি মন্দ হলেই হয়। কখনো রাস্তার বাঁয়ে, কখনো বা ডানদিকে একখানা করে নিশানা। একটুখানি সাড়া—সাইনবোর্ডের ইসারার। সুরঞ্জিত কাষ্ঠফলকে এক ঝলক কাব্যকলা—এক চোটে এক লাইনের বেশি না। আর, তার মধ্যেই পণ্যবার্তার প্রতিফলন। সেটুকু পড়তে যা পলকমাত্র সময় লাগে। পলক না পড়তেই, একটি পলের—একটির পলায়নের পর আরেকটি। আবার আরেক সাইনবোর্ড। তাতে ফের আরেক লাইন। গাড়ি চলতে চলতেই আপনার চোখে পড়বে। এইভাবে মাসিকের ধারাবাহিক কাহিনীর মতই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য একখানা কবিতা—

আপনি কী হারাইতেছেন

দেখতে দেখতে উনি উৎসাহে উছলে ওঠেন। আমিও উৎফুল্ল হই। আমার কবিতা আর উভয়ের দাঁত—এক সঙ্গে দেখা দেয়……ধীরে ধীরে নিজেদের পংক্তি উদ্ঘাটিত করে……

কোনো রূপসী কি কভু হেথা কি বেহেস্তে……
মজা পায় সজারুর ধার কাছ ঘেঁষতে……

দাড়ি রাখতে কী বাধা ক্ষুরে দিয়ে ফারৃখৎ…… ·
জানবে তো জানো দাদা মুড়ো-ঝাঁটা মারফৎ……

চণ্ডীদাসকে কয় রজকিনী রামী হে……
বাড়ি যাও, নয় তো বা এসো দাড়ি কামিয়ে……

দেখে তিনি দাঁড়িয়ে ওঠেন—থাকতে পারেন না আর—'বাহোবা কি বাহাবো! এরকমের বঢ়িয়া বিজ্ঞাপন আমি জিন্দেগিতে দেখিনি। ভাবতেও পারিনি কখনো। হবেই। আলবৎ এতে ফয়দা হবে।'

'হতে বাধ্য।' আমি সায় দিলাম—'বিজ্ঞাপনে কী না হয়? কিন্তু আপনি বসে বসে গাড়ি চালালে ভালো হোতো না কি……'

'এর পরে আরো কী আছে দেখা যাক্—' ঔৎসুক্যের আতিশয্যে তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি চালান্—

তারপরেও ছিলো। আমার অধ্যবসায় সেখানেই শেষ হয়নি।……

কণ্টকে শোভা পায়
যথার্থ! গোলাপই…
পুরুষ গোলাপ নয়
ছিলো নাকো কদাপি…

আপনি জানেন না !

'দাঁড়ান দাঁড়ান !' আমি চেঁচিয়ে উঠি হঠাৎ, এবং তারপর আর দাঁড়াই না। নিজের প্রাণ হাতিয়ে লাফিয়ে পড়ি গাড়ির থেকে। ওঁর দাঁড়াবার অপেক্ষা না রেখেই।

তারপর ?

তারপর আর ছিল না। পুনঃ-পুনরুক্তি ছাড়া কবিতার ছিল না কিছু আর। কিন্তু তার রেও আরো চার ছত্তর লিখতে হোলো আমায়। নিতান্ত নাচার হয়েই আমি লিখলাম।..... বিজ্ঞাপন-ভারতীর পদাবলীর শেষে কাব্যলক্ষ্মীর সেই শেষ পাদ-চারণা.....

ব্যাঁকা রাস্তার ঠ্যাকা !

মর্মান্তিক সেই চার লাইন অকুস্থলের মর্মরফলকে মর্মরিত হতে থাকলো.....

হেথা চিরনিদ্রিত
শেখ্ দিল্‌ওয়াস্তা।
দেখেছে বিজ্ঞাপন
ছাখেনি কো রাস্তা ॥

চোদ্দ

পৃথিবীতে দুটিমাত্র RACE, হিউম্যান্ রেস্ আর হর্স রেস্—রেসিকজনের এই রসিকতাটা পুরোনো। কেননা, এছাড়াও স্বরের রেশ, স্বরেশ ইত্যাদিরা রয়েছে।

হ্যাঁ, স্বরেশ তো আছেই। রীতিমতই আছে।

সে-ই বল্লে, 'বাজে সময় নষ্ট করছো খালি। ঘোড়ার বই পড়ে ফর্ম্ বিচার করে কি আর জেতবার ঘোড়া ধরা যায় হে? ঘোড়া তো নারীজাতি নয় যে চেহারা দেখিয়ে বাজি মারবে?'

'স্রেফ আনাড়ির মতো কথা,' জবাব দিল কানুনগো।—'ঘোড়ার পাতা অব্দি বিদ্যে না হলে নারীর সঙ্গে ঘোড়ার তুলনা—'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় রেসের মাঝখানে রেসকোর্সের রেঁস্তরায় বসে লাঞ্চ করছিলাম তিনজনায়। তিনজনেই হেরেছি, তবে অশ্বহারে, গোহারা হয়নি। হেরে ঢোল হইনি তখনো। এই তবলচি অবস্থায় রয়েছি আর কি! তালে থাকার মতই! কাজেই সঙ্গত অসঙ্গতর কথা স্বভাবতই তখন উঠতে পারে।

তখনো কিছু ছিলো সঙ্গতি। ট্যাকের সেটাকে বেশিক্ষণ ট্যাকসই রাখা যাবে না। কাজেই তা স্যাণ্ডউইচের পথে আমার উপকণ্ঠ দিয়ে পাচার করবার তাল ছিলো আমার।

'তুমি কি করে উইনার পাকড়াও শুনি?' আমি শুধালাম।

'খুব সহজে।' কানুনগো নিজের কায়দা-কানুন বাৎলায়: 'আমি করি কি, একজোড়া তাস নিই হাতে। তারপর প্যাকের ওপর থেকে উল্‌টে যাই তাস, একটার পর একটা, যতক্ষণ না একখানা টেক্কা আসে।

তারপর টেক্কা পাবার পর একটা রেসকে ধরি—ঘোড়ার নম্বর নিই—ঘোড়া আর তাস পর পর ফেলে যাই, একটার পর একটা, যতক্ষণ না ঘোড়ার নম্বর আর তাসের নম্বরে মেলে। দুজনে এক নম্বরে এলেই সেই ঘোড়াটাকে বেছে রাখি। এমনি করে পর পর ছটা করে ঘোড়া বাছি প্রত্যেক বাজির। বেছে নিয়ে সেই ছটার নাম লিখি একটা কাগজে—আলাদা চিরকুটে। লিখে চিরকুটগুলো একটা ঠোঙার মধ্যে পুরি। পুরে ছুঁড়ে দিই আকাশে। তারপর একটা চোঙা দিয়ে ফুঁ দিই। হাওয়া লাগাই। উড়ন্ত চিরকুটগুলো ছরকুট হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারধারে। যেগুলি তার মধ্যে চীৎ হয়ে পড়ে—'

'চিরকুটের আবার চীৎ উপুড় কিহে?' সুরেশ অবাক হয়।

প্রশ্নটা উচিত বলেই আমি মনে করি। কিন্তু মুখে কিছু বলি না। ওদের কথার মধ্যে আমার যা বলার তা আমি স্যাণ্ডউইচদেরই জানাই। সত্যি বলতে, তিনজনের মুখনাড়ার কাজ একলা আমাকেই তো চালাতে হচ্ছিল এধারে।

'মানে, যে চিরকুটগুলি নিজেদের নাম দেখায় আর কি! সেইগুলি তুলে নিয়ে সামনে রাখি। সামনে রেখে উঠে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে চোখ বুজি।'

'দুচোখ না এক চোখ?' জিগেস করে সুরেশ।

'এক চোখ কেন? ঘোড়ার দিকেই তাকাচ্ছি তো! না, এক চোখ নয়'—

অবাক হয়ে চায় কানুনগো—'সেণ্ট পারসেণ্ট চোখ বুজে একটা পেনসিল ফেলি ওদের ওপর। পেন্‌সিল্ বা পেনসিল-কাটা ছুরি যা পাই। তার মধ্যে যে স্লিপটা ছুরিকাবিদ্ধ হয় কি যেটার ওপরে পেনসিলের

আঁচড় লাগে—সেই ঘোড়াটাকেই আমি ধরি আমার যা লাগাবার তাতেই লাগাই—উইন, প্লেস দো-তবফা।'

একালীন অশ্বমেধ

আমি বলি—বাঃ বেশ। বহুৎ আচ্ছা।

কানুনগো আর স্যাণ্ডউইচ দুজনকেই বলি—এক কথায়। আমার স্যাণ্ডউইচ-ক্র্যাফ্‌ট্‌ চলতে থাকে—ওদের অলক্ষ্যেই।

'তুমি কি করে ঘোড়া ধরো শুনি?' সুরেশ শুধোয় আমাকে।

আমি তিনটে প্লেটই সাবড়েছি, তখন আর ঘোড়া ধরবার কোনো বাধা আমার ছিল না। আমার রহস্য অবাধে আমি ফাঁস করি—'আমার তাসটাস নয়। ছোরা-ছুরি না। আমার হচ্ছে চিরাচরিত প্রথা। টস্‌ করি একটা টাকা নিয়ে। রাজার মুখে জিৎ আর উল্‌টো পিঠে হার—এই করে প্রত্যেক ঘোড়াকেই চান্‌স্‌ দিই একবার করে। এই ভাবেই আমি ভাই, হারজিৎ বাছি। ঘোড়া পাকড়াই।'

'ফলং?' কানুনগোর জিজ্ঞাসা।

'ফলং নাস্তি।' আমি জানাই: 'একেবারে অশ্বডিম্ব। এইভাবে ঘোড়া ফলো করে দেখেছি কোনোই ফলোদয় হয় না। প্রত্যেক ঘোড়াকেই একবার করে চান্‌স্‌ দিই—কিন্তু দিয়েও কোনো লাভ নেই।

বেশির ভাগই তারা উল্‌টে পড়ে। মানে ঘোড়া নয়, সেই টাকাটাই। শেষ অব্দি আমার আর কোনো ঘোড়াই ধরা হয় না—মাঠে এসেও।'

'নাই যদি ধরবে, তো আসো কেন মাঠে?' জিগেস করে সুরেশ।

'খেলতে আসিনে, খেতে আসি। এখানকার রেস্তরাঁটা বেশ। স্যাণ্ডউইচ্‌গুলি খাসা। তবে এও আমি বলবো, আমার ধারণাটা ভুল হয় না নেহাৎ। মাঠে এসেও তো দেখতে পাই, বাজির বেশির ভাগ ঘোড়াই ডিগবাজি মেরেছে—আমার টসের মতই। দেখি যে আমার মতো বেশির ভাগ লোকের টাকাই উল্‌টে পড়েছে। তবে কি না, পড়েছে নিজের ঘরের মধ্যে নয়—একেবারে বেহাতে গিয়ে। সে-টাকা বাঁচাবার আর কোনো উপায় নেই—মারা পড়েছে বেঘোরে।'

'মাপ করবেন, এবিষয়ে আমার কিছু বলবার ছিলো।' পাশের টেবিল থেকে বেঁটেখাটো একটি লোক আমাদের টেবিলে এসে বসলো।—'ঘোড়ার নির্ভুল খবর পাবার শুধু একটি মাত্রই উপায় আছে। সে হচ্ছে, ইংরেজিতে যাকে বলে নিউমারোলজি—তার সাহায্য নেওয়া।'

'কোনো শক্ত ব্যায়রাম বুঝি? না না, সে তো নিউমোনিয়া।' শুধোবার সাথে সাথেই সুরেশ নিজেকে শুধরোয়।

'নিউমার্কেটের টিপ বলছেন?' কানুনগোর প্রশ্ন।

'নিউমারোলজি—সাদা বাংলায়, সংখ্যাতত্ত্ব।' বেঁটে ভদ্রলোক ব্যক্ত করেন।

'জানি। সাংখ্যদর্শন যার নাম।' আমি জানালাম।

'না না, সাংখ কেন, সংখ্যাই তো। সাংখ কেন বল্‌ছেন?' ভদ্রলোক বলেন: 'কথাটা তো সাংখ নয়, শঙ্খও না। আর যদি হোতোও তা হলেও, শঙ্খের আবার তত্ত্ব কি? ওর তো ধ্বনি শুধু।

শঙ্খনাদও বলতে পারেন। না মশাই, আমি নাদ ফাদের কথা বলছিনে। আমার কথা হচ্ছে সংখ্যা। এক দুই তিন—এই সব সংখ্যা আছে—জানেন না?'

'বুঝেছি, অঙ্ক।' আমি ঘাড নাড়ি, 'বলতে হবে না আর।' ভীত-নেত্রে ভদ্রলোকের দিকে তাকাই।

অঙ্কে আমার ভাবী ভয। অঙ্ক মানেই আতঙ্ক। সংখ্যারা সব গোলমেলে। ছোট বেলার থেকেই দেখে আসছি, এমনকি, পরীক্ষার বেলায়ও, অঙ্কের খাতায় গোল ছাড়া আর কিছুই মেলে না।

অঙ্করা শুধু একবার মেলে জীবনে—অঙ্কশায়িনী এলেই। শূন্যযোগেও সংখ্যা হয় তখন। তুমিও শূন্যহাতে পৃথিবীতে এসেছো, তিনিও তাই, কিন্তু দুটি শূন্য-হাত একটি মুঠোর মধ্যে এসে, এক পাণিগ্রহণে মিলে—মিলে মিশে—পূর্ণ হয়ে ওঠে। দুটি শূন্য যোগ করে এক হয—কোন্ পাটি-গণিতে কি করে হয় জানিনে! তারপর এক হয়ে অসংখ্য হতে থাকে।

সকল অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি এলেই সমস্ত মিলে যায। সব আঁক পরাস্ত তাঁর কাছে, তাঁব চেয়ে বড়ো আঁকিয়ে আর নেই। সব আঁকুনিতেই তাঁর রঙ—আর, wrong কোনটাই নয। দুয়ে দুয়ে চার না করে তার জায়গায় যদি বাইশ করো—পুত্রকন্যা সব জড়িয়ে—তা হলেও মিলেছে। সবাই এসে মিলে গেছে এক জায়গায়।

অদ্ভুত রহস্যই বলতে হয়। শূন্যরা মিলে এক হয়। এক লক্ষ হয। একাদিক্রমে, কালক্রমে। এবং সব লক্ষ্য শেষে সেই কোটিতটেই এসে মেশে আবার। লক্ষ্যভেদ করে।

'সংখ্যাতত্ত্বটা বোঝাচ্ছি আপনাদের,' ভদ্রলোকের আওয়াজে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্নভিন্ন হয়। সাংখ্যদর্শন সাঙ্গ হয় সংখ্যা-বর্ষণে।

আপনি জানেন না !

'জিনিসটা আমি শিখেছি সবে কালকে। একজন সংখ্যাতাত্ত্বিকের কাছেই। এটাকে তিনি বিজ্ঞানের মত করেই ব্যাখ্যা করছিলেন। সংখ্যাদর্শন না কি—বলছিলেন না আপনি—একটু আগেই ? তা, এটাকে আপনি ইচ্ছে করলে দর্শন না বলে বরং সাংখ্য-বিজ্ঞান বলতে পারেন, তাতে আমাব আপত্তি নেই।'

'আপনার সেই সংখ্যাজনক ব্যাপারটি কী ?' আমি শুধাই।

'শঙ্কাজনক নয় মোটেই—স্রেফ অদ্ভুত। সব আশ্চর্যরকম মিলে যায় মশাই।' সংখ্যা-বিজ্ঞানী কালকের সেই ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস কবলেন, আচ্ছা, একেবারে গোডার থেকেই সুরু করা যাক্। আপনার জন্ম-তারিখটা বলুন তো। ১৯০৪ সালের ৯ই আগস্ট আমার জন্মদিন। আমি জানালাম। তিনি বল্লেন, বেশ। এবার ৯, ৮, আর ১৯০৪ সবগুলো লিখুন একটা কাগজে। একটার নীচে একটা। এইবার সংখ্যাগুলিব যোগ দিন। কী দাঁডালো ? একত্রিশ ? এবার একত্রিশের তিন আর এক যোগ করুন। দাঁডালো—চার ? এই চাবই হচ্ছে আপনার জীবনের মূল বহস্য। মৌলিক সংখ্যা। সব কিছুর-নিয়ামক আপনার. আপনার ইহলোকের যা-কিছু তা সবই ঐ চারের ইঙ্গিতেই চল্‌ছে। বল্লেন আমায় সেই ভদ্রলোক।'

'চারই আপনাকে নাচাব কবছে, বলেন কী।' সুবেশ সোচ্চার হয়।

'ঠিক তাই, অবাক কাণ্ড মশাই। আমার বিয়ে হয়েছিল তেরই এপ্রিল। মিলিয়ে দেখলাম, তেরর এক আর তিন মিলে দাঁড়ায় চার, আর এপ্রিল হচ্ছে বছরেব চতুর্থ মাস। আমার বাডির নম্বর বাইশ। দুয়ে দুয়ে যোগ করলে চার।'

'পিলে চম্‌কানো ব্যাপাব দেখছি।' সুবেশ চম্‌কায়।

'মারণ-উচাটন বলে বোধ হচ্ছে আমার।' কানুনগো বলে।

চারের এই অনাচারে আমিও কম চমৎকৃত হই না—'অদ্ভুত তো মশাই আপনার এই চারণমন্ত্র।' আমি বলি।

'অদ্ভুত তো বটেই।' ভদ্রলোকের বিবৃতি চলে: 'আমার বড়ো ছেলের জন্ম হয়েছিল চৌঠো জানুয়ারি—কাঁটায় কাঁটায় চারটেয়। জানুয়ারিকে ত্রয়োদশ মাসও ধরা যায়। তের একুনে চার। আমার খুড়ো মারা যান বাইশে এপ্রিল—দুয়ে দুয়ে চার—আর এপ্রিল হচ্ছে চারের মাস। তাঁর উইল অনুসারে আমি চার হাজার টাকার মালিক হই। সেই টাকায় আমি একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কিনি। ১৯৩০ মডেলের আট হর্স্ পাওয়ারের গাড়ি। এখন মিলিয়ে দেখুন আপনারা।··· আট হর্স্ পাওয়ার আসলে হচ্ছে দু-চার, আর ১৯৩০-এর যোগাযোগে দাঁড়ায় তের—তার পুনযোগে ফের আবার সেই চার।'

'গাড়িটা চলেছিলো কদ্দিন?' আমার জিজ্ঞাস্য।

'মাস চারেকের বেশি না।' চার আঙুলে চাড়া দিয়ে তিনি জানান—'পরে জানা গেল, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নয়, চারহাত-ফেরতা গাড়ি।'

'অদ্ভুত তো।' চেঁচিয়ে ওঠে সুরেশ।

'ভুতুড়ে কাণ্ড।' সায় দেয় কানুনগো।

'চারই আমার সবকিছু চালাচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম তখন। সেই সংখ্যাতাত্ত্বিকও সেই কথাই বল্লেন আমায়। বল্লেন, দেখতে পাচ্ছেন তো এখন, চার ছাড়া আপনার গতি নেই। চারই আপনার জীবনের চারা।···কথাটা তখন মেনে নিতে হোলো আমায়।'

'দেখে শুনে চার ফেলুন তাহলে।' সুরেশ বল্লে: 'মাছ আপনার থেকেই ধরা দেবে।'

আপনি জানেন না !

'চারিয়ে দিন্ আপনার জীবন।' আমি বল্লাম : 'চাড়া দিয়ে বাড়িয়ে তুলুন—খাড়া করে তুলুন আপনার চারাটিকে।'

'তাই করতেই তো এসেছি মশাই।' জানালেন ভদ্রলোক : 'তাই তো এলাম আজ মাঠে। চার ফেলতে—এইখানেই।'

শুনে তিনজনেই আমরা উৎসাহিত হলাম। চার-ইয়ারির চৌকসে আমাদের ত্র্যহস্পর্শের দোষটা কেটে যায় যদি। হারের বাজি উলটে যদি উপহার হয়ে দাঁড়ায় !

'ভালোই করেছেন। আজ আবার দোসরা নভেম্বর—দেখেছেন তো আজকের তারিখটা ? দিনের দুই আর মাসের এগারো—মিলে তের—পুনর্মিলনে চার।' ব্যাপারটায় আমিও একটু চাড় দেখাই।

'তাই দেখেই তো আসা মশাই ! সেইখানেই তো আশা। এ-যোগাযোগ আমি বিফল হতে দেব না।' তিনি বল্লেন : 'চার নম্বরের বাজিতে চার নম্বরের ঘোড়া ধরবো আজ। যথাসর্বস্ব—পুঁজিপাটা যা ছিলো আমার—এমনকি সেই ফোর্থহ্যাণ্ড গাড়িটা বেচেও যা পেলাম—সব নিয়ে এসেছি। সমস্ত লাগাবো। মোটমাট চার হাজার টাকা—দু হাজার উইন্—দু হাজার প্লেস্।'

'একেবারে চূড়ান্ত করে ছাড়বেন তাহলে, অ্যাঁ ?' আমার চোখ কপালে ওঠে। 'চূড়ান্ত কিম্বা চারান্ত—যাই বলুন ?'

তিনি বলেন—হ্যাঁ। নিজের উত্তরীয়টা গলায় জড়িয়ে পাক দিয়ে তাঁর উত্তরদান।

তিন নম্বরের বাজিটা আড্ডাবাজিতেই কেটে গেছল আমাদের। চতুর্থ দৌড়ের ঘণ্টা পড়তেই উঠে গেলেন ভদ্রলোক। বাজতেই না বাজতেই।

আমার দুই বন্ধু নিজেদের জন্মতারিখ নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে গেল।

কষাকষি করে দেখবে কোন্ বাজির কতো নম্বর ঘোড়া অব্যর্থভাবে ধরা যায়। যোগ্যতার দিক দিয়ে কোন্ ঘোড়া একাধারে অশ্বমেধ আর রাজসূয়। রাজা করে দেবে এক চোটে।

বে-চারা !

নিজের জন্মদিন আমার জানা নেই। জন্মেছি কিনা সেইখানেই ঘোর সংশয়! অগত্যা, সেই ঘোরালো সমস্যায় না গিয়ে আরেক প্লেট স্যাণ্ডউইচ নিয়ে তারই যোগবিয়োগ করতে আমি লাগলাম।

রেস শেষ হোলো। অনেকের রেস্ত শেষ হোলো। আমিও রেস্তরাঁ ছাড়লাম। কানুনগো আর সুরেশ তো আগেই কেটেছিলো। কারো টিকির দেখা নেই। বেরোনোর ভিড়ে সঙ্গীদের পাত্তা পাওয়া দায়। কোথায় সুরেশ, কোথায় বা কানুনগো!

গোরু-খোঁজা খুঁজছি, এমন সময়ে গেটের মুখে সেই ভদ্রলোকের সাথে মুলাকাৎ। 'কী মশাই, জিতেছেন তো?' জিগেস করলাম আমি।—'বেশ মোটামুটি রকম? কেমন?'

'আজ্ঞে না।' ম্লানমুখে তিনি উচ্চারণ করলেন।—'চার নম্বরে এলো কিনা ঘোড়াটা।'

পনেরো

কাকা গেছলেন আসানসোল বেড়াতে। আমার বৈজ্ঞানিক কাকা।

সমাজসচেতন আধুনিক লেখকদের মতন কাকার মনে ছিলো আবিষ্কার-চেতনা। ওরকম মন নিয়ে নড়াচড়া কিম্বা নাড়াচাড়া করলে—যা হয়! আসানসোলে গিয়ে কাকা আবিষ্কার করে বসলেন অকস্মাৎ!

কয়লাখনির বাতিল দিকটায় ঘোরাফেরা করবার ফাঁকে কী যেন তাঁর চোখে পড়লো একদা। তিলমাত্র কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না, আর এতো একেবারে তাল মাত্রার। পাথরের তালের মতো কী যেন একটা পায়ে এসে লাগলো কাকার। বেশ সজোরেই।

পাথরটাই কাকাবাবুর পায়ে পড়ুক কিম্বা কাকাবাবুরই পা পড়ুক পাথরে—দেখতে না দেখতে তিনি প্রস্তরীভূত হয়ে গেলেন!

তালের থেকে এক টুকরো ভেঙে নিয়ে তিনি পরীক্ষা করলেন! পরীদের মানুষ যেমন করে ছাখে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ঠিক তেমনি করেই। তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি। আর, দেখতে না দেখতে তাঁর সারা দেহ আনন্দে যেন উথলে উঠলো। পাথরের তাল হাতে, উত্তাল আমার কাকা লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরলেন।

মুস্কিল আসান কি করে হয় জানি না, কিন্তু আসানসোল থেকেই মুস্কিলের সুরু হোলো কাকার। ঐ পাথরে পা পড়ার পর থেকেই। কয়লার খনিতে হীরে পাওয়া নয়, তার চেয়েও দুর্লভ চীজ্—সাতাশ মণ পাথরে যার সত্তর গ্রেন্ অবস্থিতি আর সেই সত্তর গ্রেনে, শত্তুর-মুখে ছাই দিয়ে, অনন্ত সম্ভাবনা—বিজ্ঞানের শেষ সীমা যেন তাঁর পায়ে এসে ঠেকলো। তাকে হিরোশিমাও বলা যেতে পারে।

আপনি কী হারাইতেছেন

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা নয়, পায়ে এসে ঠেলা দিলো হঠাৎ। কাকা ইউরেনিয়াম্ আবিষ্কার করলেন আসানসোলে। বাংলাদেশের সীমান্তে এসে ইউরেনিয়ামের খনি। ইয়া-ল্লা!

'ইউরেকা—ইউরেকা—ইউরেকা।' চেঁচাতে চেঁচাতে দেখা দিলেন আমার কাকা। বাড়ি ফাটিয়ে বাড়িতে পা দিলেন।

পিসীমা ও HERO-সীমা

পিসিমা বড়ি দিচ্ছিলেন রোদে, ছেলেমেয়েরা রোয়াকে বসে পড়ছিলো।

'কী রে বঙ্কিম, কী হয়েছে রে?' সদুপিসি শুধোলেন কাকাকে।

'ইউরেনিয়াম!' সগর্বে কাকা তাকালেন চারদিকে—'ইউরেনিয়াম রে সৌদামিনী!'

আপনি জানেন না !

বড়ো বড়ো চোখ করে সে কী বঙ্কিম-কটাক্ষ ! আর, এমন চাউনির সঙ্গে এম্‌নি চোখা স্বরে বললেন তিনি কথাগুলো যে বড়িটড়ি সব ছড়িয়ে গেল। সদু পিসিমা এক লাফে বারান্দায় উঠে আরেক হ্যাঁচকায় ছেলেমেয়েদের টেনে নিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে সেঁধুলেন। ঢুকেই না, দড়াম্‌ করে খিল এঁটে দিলেন দরজার। বাঘ-ভালুকের মতই মারাত্মক কোনো জানোয়ার এসে পড়েছে টের পেতে তাঁর দেরি হোলো না।

কিন্তু কাকা আমার দাঁড়ালেন না আর। তখনো জানাবার তাঁর বাকি ছিল : তখনি তখনি সহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছে ছুটলেন। খবরটা সরকারী প্রতিনিধিদের বলতে হয় গিয়ে। চেয়ার-ম্যানের কাছে নিজের বিজ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি প্রকাশ করলেন অতঃপর—'আমি ইউরেনিয়াম্‌ আবিষ্কার করেছি। আপনাদের এই আসানসোলে। বুঝেচেন ?'

চেয়ারম্যান এরকম সাংঘাতিক খবরেও টললেন না একটুও। নিজের চেয়ারে অটল থেকে বল্লেন—'বলেন কি ? সাদা চোখেই ?' শুধোলেন শুধু তিনি—'খোলা চোখেই দেখতে পেলেন নাকি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই চোখ দিয়েই। দেখাতে পারি আপনাকে, দেখতে চান যদি।'

'না। কী হবে দেখে ? আরো অনেকেই তো আবিষ্কার করেছেন। অনেকদিন আগের আবিষ্কার।'

'তা বটে। কিন্তু এই আসানসোলে ? আমি যে আপনাদের এই আসানসোলের মতন জায়গায়—'

'সাদা চোখে দেখতে পেয়েছেন এই যা আপনার বাহাদুরি ! অন্য সবাই দূরবীন দিয়ে ছাখে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরবীনে,

ইউরেনিয়াম্ তো বটেই, এমন কি, নেপচুনও নাকি দেখা যায়। এবকমও শুনেছি। আপনি বোধহয় তা দেখতে পাননি? যাই হোক,

পাহারোলার পাণিগ্রহণ

তবু যে আপনি এত দূর থেকে—কলকেতা থেকে এখানে এসেচেন ঐ দেখতে, এতে আমাদের এ জায়গা ধন্য হোলো! আর, একথা এত কষ্ট করে আমাকে জানাতে এখানে এসেছেন এর জন্যও আমার ধন্যবাদ। আচ্ছা, নমস্কার।'

* মুখ ভার কবে ফিবতে হোলো কাকাকে। কিন্তু মনের ভার (এবং পকেটেরও) মোচন করতে না পেরে তিনি মুষড়ে পড়লেন, খবরটা

কাউকে না বলে যেন তাঁর স্বস্তি হচ্ছিল না। পথে নেমেই এক কনেষ্টবলকে কাছে পেয়ে তাকেই ডেকে চুপি চুপি তিনি বললেন :

'ইউরেনিয়াম আছে আমার কাছে জানো হে ? এই পকেটে।'

জানামাত্রই পাহারোলাটা হাতালো তাঁকে তক্ষুনি। 'চলো ফাঁড়িমে' বলে বামালসমেত পাকড়ে নিয়ে চললো থানায়। আর, ফাঁড়িতে গেলেই ফাঁড়া। গোড়ায় তো পাহারোলারাই চাঁদা করে লাগালো ঘা কতক, তার পরে—সেই দলাই মলাইয়ের পর হাজির করলো তাঁকে দারোগার কাছে।

'এই- এই ইউরেনিয়াম।' কাকাবাবু দেখালেন দারোগাকে—'আমি পেয়েছি।'

'ও—এই !' দারোগাবাবু দেখলেন তাকিয়ে—'তা, এ তো খুব দামী জিনিস, রেখে দিন যত্ন করে। না যেন হারায়।' বললেন তিনি দেখে শুনে। বলে' পাহারোলাকে ডাকালেন আড়ালে—'ইনকো ডাগ্‌দার বাবুকো পাশ লে যাও। বাবুকো দিমাক্‌কা কুছ গড়বড় হুয়ী।'

এক দাবাইখানা থেকে আরেক দাবাইখানায় চল্লেন কাকা—পাহারোলার বগলদাবাই হয়ে। দারোগাবাবুর কাছ থেকে কোনো রোগাবাবু এলে পাড়ার ডাক্তারের কাছে স্বভাবতই তার খাতির হয়। হবার কথাই। ডাক্তারবাবু তাঁকে পাবামাত্রই ধরে শুইয়ে দিলেন আরাম চেয়ারে। তারপরে নাড়ি ধরে জিগেস করলেন—'বলুন তো, কী হয়েছে আপনার ?'

'ইউরেনিয়াম।' কাকাবাবুর গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো।

'কদ্দিন থেকে ?'

'আজ সকালে সবে আমার নজরে পড়েছে।' আরাম চেয়ারে কাত হয়ে তিনি কাতরান্।

আপনি কী হারাইতেছেন

'উম্‌ম্‌ম্‌।' বলে ডাক্তার স্টেথিস্‌কোপ বার করে বসালেন তাঁর বুকে, মুখে লাগালেন থার্মোমিটার, তারপরে সমস্ত দেখে শুনে বল্লেন—'না না। তেমন শক্ত কিছু হয়েছে বলে তো বোধ হচ্ছে না। কিছুই হয়নি আপনার। আচ্ছা, কাশুন তো খানিক।'

'কিন্তু, কিন্তু, ইউরেনিয়াম—' কাশির বদলে কাকার সেই পুরোনো কাশুন্দি।

'না না। তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, অকারণ আপনি ঘাবড়াচ্ছেন। ভয় পাবার মতন কিছুই হয়নি।' জানালেন ডাক্তার: 'আপনি যা ভেবেছেন তা নয়। কাল রাত্তিরে কি গুরুতর রকমের খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়েছিলো? কী খেয়েছিলেন কালকে—বলুন দেখি।'

'কিছু না। কিচ্ছু খাইনি। শুধু খান দুই সুজির রুটি—' সোজা-সুজি তিনি বলতে যান।

'তাই! যা ভেবেছিলাম—। যাক্‌, আজ আর কোনো সলিড্‌ ফুড্‌ নয়। খালি একবাটি জলবালি পাতি নেবুর রস দিয়ে—বুঝেছেন?'

'কিন্তু—কিন্তু—আমার এই ইউরেনিয়াম—?' বাধা দিয়ে কাকা বল্‌তে যান। তারপরেও।

'বলছি তো, তেমন-কিছু নয়। সেসব কিছু হয়নি। তবুও আপনি যখন ছাড়চেন না, তাহলে—দাঁড়ান একটু।'

জলযোগের ব্যবস্থা দেবার পর ডাক্তারকে আবার তাঁর জলবিয়োগের ব্যবস্থা করতে হয়। কম্পাউণ্ডার কাকাবাবুর কাছে গিয়ে—বাধ্য করে কি বাধিত করে বলা যায় না—তাঁকে হাল্‌কা করে। তারপরে তাঁর কাছ থেকে ভর্তি বোতল হাতে নিয়ে পাশের ঘরে যায়, খানিক বাদে ফিরে এসে ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করে সে।

আপনি জানেন না !

ডাক্তার কাগজখানার ওপর চোখ বুলিয়ে বলেন—'নাঃ, কোনো দোষ নেই আপনার ইউরিনে। কিছুমাত্র না। যান—যা বললাম। জলবালি খেয়ে শুয়ে থাকুন গে। বিশ্রাম নিন্ সারাদিন। ওষুধপত্তর কিচ্ছু লাগবে না। কোনো ভয় নেই, ওতেই সেবে উঠবেন—আপনার থেকেই।'

কাকাবাবু উঠলেন—আপনার থেকেই। কিন্তু বাধা এলো ডাক্তারের থেকে—'আমার ফী-টা? আট টাকা ভিজিট, আর আপনার মূত্র-পরীক্ষার দরুন আরো টাকা চারেক। মোটমাট বারো টাকা মাত্র। অবিশ্যি, কন করেই নিয়েছি। দারোগাবাবুর কাছ থেকে এসেছেন বলেই এই কন্‌সেসন করলাম।'

বারো টাকা গুনে দিয়ে—গুণোকাব দিয়ে—বাড়ি ফিরলেন কাকা-বাবু। বেশ মনমরা হয়েই ফিরলেন। এত বড়ো আবিষ্কারের বার্তাটা কারু কাছে বিজ্ঞাপিত করতে না পেয়ে তাঁর অবস্থা ক্রমেই আরো কাহিল হয়ে উঠছিলো। ফিরতি-পথে এক অন্যমনা ছোক্‌রার সঙ্গে তাঁর টক্কর লাগলো। তিনি ভাবতে ভাবতে ফিরছিলেন, আর ছেলেটি একটি বইয়ের পাতা খুলে পড়তে পড়তে আসছিলো—রেলগাড়ির মতন ঠোকাঠুকি লেগে গেল দুজনেব।

কাকাবাবু দেখলেন বইখানা বিজ্ঞানের। ধাক্কায় দুঃখ ভুলে এতক্ষণে বুঝবার মতন বুঝদার একজনকে পেয়েছেন দেখে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। মনের মানুষ পেলে মানুষের মনে যা হয় সেই আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে বল্লেন—'ওহে শোনো শোনো—'

এটি বিজ্ঞানের ছাত্র—এর কাছে হয়ত বলা যায়। যে-কথা এ-জীবনে রহিয়া গেল মনে, সে-কথা একে যেন বলা যায়! বললে এ বুঝবে। বুঝতে পারবে। এ-ই পারবে।

'দাঁড়াও, শুন্‌ছো? ইউরেনিয়াম!' তিনি তার কানের কাছে গিয়ে কথা পাড়লেন।

'আজ্ঞে, আমি অরুণ নই। আমার নাম নিকুঞ্জবিহারী।' বলে' সে আর একমুহূর্ত দাঁড়ালো না। কী ভেবে ছেলেটি তীরবেগে ছুট্ দিল—কী দেখল সে সেই জানে। নিমেষের মধ্যে কাকাবাবুর জীবনেব থেকে তিরোহিত হয়ে গেলো সে—দেখতে না দেখতেই।

তারপরেও ছাড়েন নি কাকা। এক পক্কশ্মশ্রু পায়জামা-পরা ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছিলেন। লোকটি মনোহারী দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণহারী যতো জিনিস দেখে কালহরণ করছিলো।·· দেখ্‌তাই তাকেই পাকড়ালেন শেষটায়।

'শুনুন মশাই! জানেন, আমি ইউরেনিয়ামের খোঁজ পেয়েছি।'

'পেয়েছেন? আহা, বাঁচলাম! খোদার মেহেরবানি।' জবাব এলো পায়জামাইয়ের—'দেখবেন, যেন ফের না ভাগে। আল্লাব কুদ্‌রতে যখন পেয়ে গেছেন, তখন হুঁশিয়ার! গরু আর জরু সব সময়ে নিজেকেই সামলাতে হয়—নজরে নজরে রাখতে হয় নিজের।' এই জরুরি উপদেশ দান করে আবার তিনি মনোহারী দোকানের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

কাকাবাবু দাঁড়ালেন না আর। বাড়ি ফিরেও না। সেই দিনই—সেই মুহূর্তেই তিনি, এমন কি, তাঁর বালি পথ্য স্থগিত রেখে—ডাক্তারি উপদেশ অগ্রাহ্য করেই, পাড়ি দিলেন কল্‌কাতায়। সটাং হাওড়া স্টেশনে পা দিয়ে তারপরে তাঁর হাঁপ ছাড়া। গাড়ির ইঞ্জিনের মতই—এক হাঁসফাঁস—তাঁর সেই সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

স্টেশনেই এক পুরাতন আলাপীর সাথে মোলাকাৎ হঠাৎ। হা অদেষ্ট, এতক্ষণে এত ধাক্কার পরে এই এক চেনা মুখ। প্রিয়জন

আর প্রয়োজন—একাধারে। এতক্ষণ পরে। সাত কাণ্ডের পরে এখন !

হাঁসফাঁসের পর এবার হাসলেন কাকাবাবু। ফাঁস করবার আসল লোক পেয়েছেন এতক্ষণে। এক-মুখ হাসি নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন তার কাছে—'ওহে হরিশ, শোনো শোনো, খুব দামী খবর আছে আমার কাছে। বড়লোক হবার মোকা—আছো কোথায় ?'

'কী ? কী খবর ? কিসের খবর হে ?' বন্ধুটি আগ্রহে উটমুখো হয়ে এগিয়ে আসে।

হ্যাঁ, আদত লোক পেয়েছেন তিনি এতক্ষণে। কাকাবাবু বাঁধভাঙা দামোদরের মতই উদ্দাম হন। —'বলছি শোনো, জবর খবর। ইউরেনিয়ামের খবর। শোনো, বলি তোমায়।...'

বন্ধুটি কাকার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে—'চুপ্ চুপ্—এখানে না। শুনতে পাবে অন্য কেউ।' বলে' তাঁকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো—'বল তো শুনি, কী খবর ?'

'ইউরেনিয়ামের খবর। যা তা না।' কাকাবাবু আহ্লাদে ডগমগ। এতক্ষণে একজন সমঝদার অনুসন্ধানীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন। একদিনেই তাঁর দ্বিতীয়—(এবং অদ্বিতীয়) এই আবিষ্কার।

'ইউরেনিয়াম ?' লোকটা মাথা চুল্‌কালো খানিক : 'ইউরেনিয়াম ? কোন্ বাজিতে দৌড়চ্ছে হে ? কত নম্বরের ঘোড়া ? অ্যাঁ ?'

শুনে হতজ্ঞান কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে—সেই প্ল্যাটফর্মের ওপরেই—লম্বালম্বি। পতন ও মূর্ছা, কিম্বা মূর্ছা ও পতন—কী যে তাঁর ঘটলো, বোঝা গেলনা সঠিক। উটের পিঠে শেষ কুটোটির মতই—তাঁর এই হরিশে বিষাদ ! সেই ভারে তিনি ভেঙে পড়লেন। কাকস্য পরিবেদনা !

ষোলো

ফ্ল্যাটে থাকার অনেক অসুবিধা। পাড়ায় থেকে যদি বা প্রতিবেশীকে এড়ানো যায় ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করে সেটা দায়। পাড়ার সবাই আলাদা আলাদা বাড়ির বাসিন্দে কিন্তু এখানে এই বাড়াবাড়িতে তোমার ওপরে নীচে, আশে পাশে, চার ধারেই ফ্ল্যাট, — আর ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘন বিন্যস্ত পাড়াপড়শী। এক বাড়ীর মধ্যেই পুরো একটা পাড়া—এড়াবে কাকে? এই পাড়াটেদের সাঁড়াশী আক্রমণ থেকে পালাবে কোথায়? পোড়ো বাড়ির ঠিক উল্‌টো, আস্ত একটা পাড়া বাড়ী — এই ফ্ল্যাট সীস্‌টেম্।

পাড়াগাঁয়ে থাকা বেশ বাবা! দূরে দূরে বাস, আর গ্রামবাসীদের মধ্যেও আড়াআড়ি। কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটমহলার এই অদূরপরাহত বসবাসের আওতায়, একমাত্র দুর্বাসারাই বোধ হয় বাঁচতে পারে— ছোঁ-আঁচ বাঁচিয়ে। তিরিক্ষে মেজাজের না হলে বাঁচন নেই। ষাঁড়ের মতন হলে তবেই আর সব বাসাড়েরা কাছ ঘেষে না। কিন্তু আমার ন্যায় মাটির মানুষ যারা — দুর্বাসা নয় — বরং দুর্বার মতই অসার— তাদের তো এই আধুনিক হানাবাড়ীর পড়শীরা পায়ে মাড়িয়ে চলে।

বিশেষতঃ, যে বিয়ে করেনি তার ঘরে তো অবাধ প্রবেশ সবার। নেপথ্যে পর্দানশিন্ কেউ নেই বলে বেপরোয়া যে কেউ যখন খুসি তার ঘরে এসে হানা দিতে পারে, খেয়াল মত আড্ডা জমাবার বাধা নেই কারো। আর, যার অন্দর বলে কিছু নেই তার অন্তর বলেও কিছু থাকতে নেই। তার ঘর তো বারোয়ারি মণ্ডপ—সকলের বেসরকারী বৈঠকখানা। নিজের ফ্ল্যাটে, নিজের বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে, একান্তে

একাকী একটু যে আয়েস করবো তার যো নেই। অম্‌নি পাশের ফ্ল্যাট থেকে শ্রীমান বৃন্দাবন এসে হাজির!

ভারী পায়ে মুখ কালো করে এলো। এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো ঠেসে। বসেই থাকলো। বেশ গুম্ হয়ে থাকলো — অনেকক্ষণ।

'বৃন্দাবন অন্ধকার যে! ব্যাপার কী?' আমি আর থাকতে পারলাম না।

'আর বলো কেন দাদা!' বললে বৃন্দাবন: 'ওপরের লোকগুলোই খেলো আমায়। ডোবালো একেবারে।' মজ্জমান ভুক্তভোগীর প্রতি আমার মজ্জাগত সহানুভূতি।—'কিরকম? কিরকম?' আমি উৎসুক হয়ে উঠি। উঠে বসি আমার বিছানায়।

বৃন্দাবনের মাখন তোলা

'খালি ধারে কাটছে আমার।' জানালো সে: 'এধারে ওধারে চার ধারেই কাটছে। এটা ওটা সেটা—একটা না একটা কিছু হাতাচ্ছেই আমার কাছে সব সময়।'

এই বলে বৃন্দাবন পাশের টেবিলের মাখনের কৌটো থেকে চামচে করে এক-খামচা নিয়ে নিজের মুখে পুরলো।

মুখ মুছে বললো তারপর: 'বেশ খেতে। অষ্ট্রেলিয়া না নিউজিল্যাণ্ড?'

'বোম্বে ব্র্যাণ্ড।' আমি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললাম।

আপনি কী হারাইতেছেন

'কি করে সুরু হোলো বলি। প্রথম যখন ওরা এলো ওপরতলায় —মাস তিনেক আগের কথা—সদ্যবিবাহিত দুটি তরুণ-তরুণী—কি করে যেন আলাপ হয়ে গেল আমার সঙ্গে। সিঁড়ি ধরে উঠতে নামতে ধাক্কা লেগেই, না, কি করে ঠিক বলতে পারব না। গায়ে-পড়া আলাপ মোটের ওপর। তা হোক্, মেয়েটির মুখখানি বেশ মিষ্টি—দেখলেই কেমন মায়া করে!' বৃন্দাবন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

'মায়ার কথা বাদ দাও।' আমি বলি: 'তোমার মায়াবাদ রাখো। সার কথা বলো।'

'তাই তো বলছি হে, কিন্তু মায়ার কথা বাদ দিয়ে কি বলা যায়? মেয়েটির নামই যে মায়া।' দৈর্ঘহীন তার দ্বিতীয়প্রস্থ নিশ্বাস।

'তাহলে তো ও-মায়া ক্রমেই বাড়বে। বাড়বে ছাড়া কমবে না।'

'বেড়েওছে। প্রথম অবশ্যি এসেছিলো ছেলেটিই, কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটা চাইতে। সেই থেকেই আরম্ভ। সে তো গেল গোড়ার কথা। সেদিন সকালের কথা। সন্ধ্যার পরেই সে দেখা দিলো আবার —মশারি খাটাবার জন্যে গোটা কয়েক পেরেক চাই। দিলাম পেরেক। তারপর থেকে মেয়েটিই সুরু করলো আসতে। চায়ের জন্যে এক ফোঁটা দুধ কিম্বা একটু মিলো, কি চায়ের গুঁড়ো, নয়তো কয়েক চামচ চিনি—'

'চিনি? বলো কি?' আমি বলি— 'এ যে মিলো-নে মাধুর্য?'

'হ্যাঁ, চিনি।' মলিন হাসি হাসলো বৃন্দাবন: 'মিলো কি ওভ্যাল্‌টিন্ দেয়া যায়, খালি টিনও দেয়া চলে কিন্তু চিনি দেয়া এই রেশনের বাজারে—' বৃন্দাবন আর কিছু বলে না। বলতে পারে না। নিশ্বাস ছাড়ে।

'প্রায় অপারেশনের মতই।' আমিই সম্পূর্ণ করি: 'মারামারি-কাটাকাটি ব্যাপার। কিন্তু তোমার কাছে ধার চাইছে বইতো না।'

'হ্যাঁ, ধার। ধার তো বটেই। ধারটাই বড্ডো বেশি যে! দিব্যি বড়দা পাতিয়ে মেয়েটি বড়ো দা দিয়েই কাটছে আমায়। বেশ ধারালো দা ভাই!'

'তোমার সম্বন্ধে উচ্চধারণা আছে মেয়েটির—মনে হচ্ছে। তোমাকে ব্যাঙ্ক অব বরোদা ঠাউরেচে হয়তো।' ওকে একটু উৎসাহিত করার প্রয়াস আমার।

'বলতে কি, সত্যিই একটু মায়া হয়েছিলো গোড়ায় আমার! তরুণ দম্পতি একেবারে আন্‌কোরা বিয়ে। কপোত-কপোতীর মতই অসহায়। আনাড়ি, নতুন সংসার পাতছে, সংসারের কিচ্ছু জানে না। কার না মায়া হয়? ভেবেছিলাম একটু সাহায্য করা যাক ওদের। কিন্তু সেই গোড়াকার টান এখন আগায় এসে…'

বৃন্দাবন চুপ করে। তারপর আর আগাতে পারে না।

দুঃখ হয় আমার। গোড়ায় বিচার করে কাজ করেনি, এখন কোথাও চারা খুঁজে পাচ্ছে না। বেচারা!

'এমনটা হবে ভাবতে পারিনি গোড়াগুড়ি।' বলে বৃন্দাবন থামে। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে কি না ভাবে।

'গোড়াতে শুধু গুঁড়িটাই ছিলো'—আমি বলি: 'এখন ক্রমে ক্রমে আগাতে আগাতে পত্রপল্লব শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে আগাগোড়াই টানাটানি দাঁড়িয়েছে। অনেক ফ্যাক্‌ড়া।' আমার সহানুভূতি জানাই।

'টানায় কিছু আর রাখা যায় না এখন। কী বলো?'

বৃন্দাবন কোনো জবাব না দিয়ে দৃষ্টান্ত দিল। আর এক খাব্‌লা মাখন তুলে নিলো। তারপর দেরাজের টানা থেকে চিনি বার করে মাখিয়ে নিলো ভালো করে। চিনির কথা তো আগেই উঠেছিল, এখন

আপনি কী হারাইতেছেন

টানাটানির কথায় টানার কথাটা মনে পড়ে গেল তার। চিনলো টানাটা, টানলো চিনিটাও।

বৃন্দাবনকে চিনি তো! ননীমাখনের ওপর এই রাহাজানি একান্তই বৃন্দাবনসুলভ। দ্বাপর যুগ থেকেই চলে আসছে বরাবর। আমি আর ওদিকে তাকাই না।

তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ি: 'তারপর কী হোলো? কী দাঁড়িয়েছে তারপর এখন?'

মাখনের প্রতি বিমুখ করার জন্য ওর মুখকে অন্য দিকে আকৃষ্ট করার আমার চেষ্টা। ওর জিভকে অন্য বিষয়ে উজ্জীবিত করা যায় কি না দেখি। কাজের কথায় না হলেও কথার কাজে ব্যাপৃত রাখতে চাই।

তারপর? তারপর মাখন-জড়িত মিঠে গলায় ও বলে: 'তারপর আজ এটা কাল সেটা—বলেছি তো। যেটা নেয় সেটা আর ফেরৎ দেয় না। এমন কি, আমার মশা-তাড়ানো ফ্লীট আর তার পিচকিরিটাও নিয়ে গেছে। তাইতেই আমায় কাহিল করে দিয়েছে আরো। মশার জ্বালায় রাত্তিরে ঘুমুতে পারিনে ভাই।' বৃন্দাবন ফোঁস করে।

'ফ্লীট নিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে দেখছি—অ্যাঁ—বলো কী?' সত্যি, মায়াদের অমায়িকতা ভাবলে অবাক হতে হয়।

'হ্যাঁ। কিন্তু সেখানেই ইতি নয়। আজ সকালে আবার মেয়েটা এসে আমার টেলিফোনটা ইউজ করতে চেয়েছে। কাকে নাকি ফোন্ করবে বিকেলে।'

সর্বনাশ করেছে! কোনো বাঙ্ময়ীর সঙ্গে টেলিফোনের ঘনিষ্ঠতা ঘটলে অনিষ্টতা কতো দূর গড়াতে পারে আমার অভিজ্ঞতায় অজানা নয়। আমি আঁৎকে উঠি।

আপনি জানেন না !

'কী করা যায় এখন?' ও আমার পরামর্শ চায়। আর সেই ফাঁকে আর একতাল মাখন মুক্‌ডেনে পাচার করে।

'নাইদার এ বরোয়ার নর এ লেণ্ডার বি।' আমি শেক্‌সপীয়ার ধরে টান মারি। যুত্‌সই একটা স্বদেশী বচন খুঁজেছিলাম, পেয়েছিলামও, কিন্তু আওড়াতে গিয়ে দেখলাম সেটা মজবুতসই নয়। বিবেচনা করে দেখতে গেলে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ-এর বয়েৎটা বৃন্দাবনের বিপক্ষেই যায়। মায়াবাদের ওপর ফের চার্বাক-বিস্তার করে কাটা ঘায় নুনের ছিটে নয়, ফাটা পায় ঘিয়ের মালিশ দিয়ে পালিশ চড়িয়ে আরো চটক্‌দার করা হবে বইতো না!

'ছোঁড়াটা আর আসে না আজকাল, ছুঁড়িটাকেই পাঠায়। ও যদি আসতো আর ধার-নেয়া-হাতুড়িটা ফিরিয়ে দিতো আমায়—অন্তত একবারটির জন্যও—তাহলে ওর মাথায় সেটা ঠুকে—ভালো করে ঠুকে ঠুকে—পরের ওপর নির্ভর করাটা যে কদ্দূর খারাপ তা বেশ করে ওকে সম্‌ঝে দিতাম। হাতেনাতে শিক্ষা যাকে বলে! কিন্তু মেয়েটাই আসে যে!'

'দরজা বন্ধ রাখো। কড়া নাড়লেও খুলো না। কিছুতেই নয়।' আমি ওকে কড়া হতে বলি, 'একটু কড়াকড়ি করলে হয় না?'

'তাই করেছিলাম ভাই একবার। কিছুতেই খুলিনি দরজা। পরে টের পেলাম, অনেক পরেই অবিশ্যি, একজনের কাছে আমি পাঁচ টাকা পেতাম, সে-ই নাকি টাকাটা ফিরিয়ে দিতে এসেছিল—এসে কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে।' বলে মনের দুঃখ লাঘব করতে আরেক তাল মাখন জিভের তলায় তলিয়ে দিতে লাগে সে এই তালে।

আপনি কী হারাইতেছেন

'তাহলে না বলতে চেষ্টা করো।' আমি বাৎলাই : 'হাঁ করে সব সহ্য না করে না বল্লেই পারো। দেব না—ফুরিয়ে গেল। না — না — না! একবার তাই বলেই ছাখো না! অন্ততঃ চেষ্টা করতে দোষ কি?' নাস্তিক্য-ধর্মে আমার দীক্ষাদান।

'না। কাউকে আমি না বলতে পাবিনে।' সে বলে, একটু বিমর্ষ হয়েই : 'একেবারে কারো মুখের ওপর ওকথা বলতে আমাব বাধে। কেমন যেন কুণ্ঠা হয়। মুবোদ্ হয় না।'

'তুমি মরদ্ নও।'

মায়াবাদী, তার ওপরে নাস্তিক না, এহেন লোকের পরকালে বৈকুণ্ঠ থাকলেও, ইহকাল যে ঝরঝরে, সেকথাটা ওকে বুঝিয়ে দিই। আজকের এই তুফানে যে না-য় STICK করতে পারে না তাব নির্ঘাৎ জলাঞ্জলি!

'তুমিই বলো, কোনো মেয়েকে কখনো না বলা যায়? কেউ পারে বলতে? মায়া না হয়ে তার নাম না হয় মহামায়াই হোলো? আন্নাকালী কি কৈবল্যদায়িনীই হোলো না হয়?'

'তাহলে এক কাজ করো, শত্রুপরিখায় গিয়ে চড়াও হও—লড়াই চালাও সেখানে। অ্যাটাক্ হচ্ছে বেটার ডিফেন্স। ওদের শেখানো বিদ্যে ওদেরকেই শেখাও। চলে যাও ওপরের ফ্ল্যাটে—যখন তখন—নুন, চিনি, আলু, পেঁয়াজ, গরমমশলা চেয়ে আনো গিয়ে। আর হ্যাঁ, পাঁচফোড়ন! পাঁচফোড়ন চাইতেও দ্বিধা কোরো না।'

বৃন্দাবনের তপ্ত কটাহে—ওর মাথার খুলিতে—যেখানে ঘিলু থাকবার কথা সেই খোলায় আমি একটু ঘি ঢালি। তারপরে ফোড়ন দিই। যদি একটু বুদ্ধি খোলে তার।

'যা বলেছো !' বলতে না বলতে সে চড়বড় করে ওঠে : 'হ্যাঁ, এটা মন্দ নয়। একটা কথার মতো কথা ! তোমার এ-যুক্তিটা বেশ।'

'বেশ। তাহলে এইটেই পরীক্ষা করোগে।'

'করে দেখবো। আচ্ছা, তোমার ঘরে কি রুটিটুটি কিচ্ছু নেই ? খালি মাখন ?' বলে সে উৎসুক নেত্রে চারিধারে তাকিয়ে ছাখে। দেখে টেখে —মাখনের কৌটায় চামচ বাড়ায়। —'খালি খালি মাখন কি খাওয়া যায় ?'

LOAF-আ-লুফি !

খালি মাখনের অখাদ্যতায় বুঝতে পারি মাখনেরও খালি হবার আর দেরি নেই ! তাড়াতাড়ি বলে উঠি— 'যাও না, যাও না এখুনি ! মায়াদের কাছ থেকে আধ পাউণ্ডের রুটি এক-খানা ধার করে আনো গে। আনো না গিয়ে ?'

'মন্দ বলোনি,' বলেই সে লাফিয়ে উঠে মাখনের ড্যালাটা গালে পুরে দিয়ে গলে পড়ে।—'দাঁড়াও, এখুনি ওদের জব্দ করছি।' বলে যায়। লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

মিনিট কয়েক বাদেই লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে। আস্ত এক পাউণ্ডের ফার্পো হাতে করে। যেম্‌নি মোটা তেম্‌নি গোটা একখানা !

আমার ওষুধে হাতে হাতে ফল দিয়েছে দেখে আমার উল্লাস হয়।

আপনি কী হারাইতেছেন

'দেখলে তো? হাতে হাতেই বাজিয়ে দেখলে!' উৎফুল্ল হয়ে আমি বলি—'সুদ শুদ্ধু উসুল হয়ে গেল!'

'তোমার কথাটা গোড়ায় আমি তলিয়ে দেখিনি। কিন্তু ঘর থেকে বেরুতেই টের পেলাম। আসল রহস্যটা বুঝতে পারলাম তখন। বুঝেই—'

বলতে গিয়ে বৃন্দাবন বুজে যায়—খানিকক্ষণের জন্য। মাখম মাখানো রুটির খণ্ডটা, গণ্ডেপিণ্ডে গিয়ে, বুজিয়ে দিয়েছিল ওকে।

তাহলেও বৃন্দাবন আমাদের বুঝ্‌দার। সবকিছু তলিয়ে বোঝার লোক সে। সেকথা আর বলতে হয় না। বুজেই সে মুখ খোলে—

'হ্যাঁ, ভাই! তলিয়ে বুঝলাম তোমার কথাটা। বুঝেই না, তলার ফ্ল্যাটের ভাড়াটেদের কাছ থেকে চেয়ে আনলাম।' বৃন্দাবন আমায় জানালো — 'চমৎকার লোক তারা! চাইতে না চাইতেই দিলো।'

মাছ বিনা একদিনও চলে না বিনিব। মাছ নইলে ওর ভাতই রোচে না। বিনিময়ে সন্দেশ পোলাও পেলেও সে খুসি নয়। আমার কিন্তু ঠিক উল্‌টো। মাছের বদলে মাংস পাই তো ভালোই, তাই খাই সুবোধ বালকের মতন—অম্লানবদনে। আর মেঠাই হলে তো কথাই নেই। পোলাও পেলেও আমি পালাবো না। পায়েস ফেলেও নয়। নিতান্তই যদি এসব না জোটে তখন মাছ হলেই আমার চলে যায়। বেশি নয়, ঝালে ঝোলে অম্বলে খান পাঁচেক মাছ। আর ভাজাতেও খান পাঁচ হলে মন্দ হয় না।

বাজারে আজকাল মাছেব যেমন ঘাট্‌তি, তাব ওপরে আবার তার দামেরও তেমনি কাট্‌তি। গলাকাটা দাম। তাই স্বভাবতই, মাছ চাইলে, ঘাটের দিকে নজর দিতে হয়। বিনি তাই দিচ্ছিল। ছিপ নিয়ে কল্‌কাতার কোনো একটা ঘাটে বসবার জন্য সাধছিল আমায়। কদিন ধরেই চলছিলো এই সাধ্যসাধনা।

আমি বলেছি—খালি ঘাটের দিকে নজব দিলেই হয় না, নজরানা দিতে হয়। কল্‌কাতার পুকুব-ঘাটে মাছ ঘাঁট্‌তে ট্যাক্‌সো লাগে। গুচ্ছের টাকা বোন্‌!

টাকা তো বিনির কী! টাকার কথা তোলাই আমার ঘাট। সে মুখ ভার করে থাকে।

তখন বলি— ছ্যাখ্‌, তপস্যা করার ধাত আমার নয় তো! আর, সারাদিন ঘাটের ধারে বসে তপস্যা করলেই বা কি! মাছ হচ্ছে ভগবানের ন্যায়—নিজগুণে ধরা দিলেন তো দিলেন, নইলে তাঁকে ধরে

আনে কার সাধ্যি ? সকলের গোড়ায় তাঁর মৎস্য-অবতার হবার কথাটাই ধর—' আমি ভাগবতী কথার অবতারণা করি—'কেউ তাকে আঁটতে পেরেছিলো ? তাঁকে পাকড়াতে গিয়ে মাঝ থেকে আমার এই হৃষ্টতা যাবে, পুষ্টতা যাবে, কিন্তু তাঁর নাগাল মিলবে না। না গালে, না আমার ছিপে। কেবল নিজেই আমি শুকিয়ে ছিপছিপে হয়ে যাবো।'

আমি পুরাণ-কথা পাড়ি, আর ওর সেই পুরোনো কথা। আমার সৃষ্টিরহস্যের ধারণা ওর এক তাড়নায় উড়ে যায়।

ও বলে—'চাড় থাকলে ভগবানকেও মেলে, বলে গেছেন পরম-হংসদেব। আর চার ফেল্‌লে মাছ মিলবে না ? তুমি বলো ?'

এই বলে সে চাড়া দিতে চায়—এই বেচারাকেই !

কিন্তু মাছ ধরা ঢের পরের কথা ! ছিপের ওধারে মাছ গাঁথতে হলে এধারে তার আগে আমাকেই গাঁথতে হয়। মৎস্য-গাথা, সে তো ক্ষণিকের। নিজের গাঁথনি অনেকক্ষণ। আমার ছিপ দিয়ে আমাকে গাঁথতেই বেগ পাচ্ছিল সে গোড়ায়। চাড় দিলেও আমি নাচার !

না বাপু, সাধ্যসাধনা আমার পোষায় না। আরে, তা যদি করতেই হয় তো ঘাটের ধারে অমন তেতে-পুড়ে কেন, বালিশে মাথা রেখে কম্বল ঢেকে আরামে কড়িকাঠের সাধনাই তো বেশ। ভগবান কড়িকাঠ-অবতার হন্‌নি তা সত্যি, এবং ভূমিকম্প হয়ে বাড়ী-ঘর মাথায় না পড়লে কখনো ঐরূপে অবতীর্ণ হন না তাও ঠিক, কিন্তু তাহলেও—

ট্রামে বসে যেতে যেতে এইসব তত্ত্ব ফলাও করে বোঝাচ্ছি ওকে। ও হাঁ করে শুনছে। বলে কতো খাল, বিল, ডোবাই বুজে গেল ! আমার বোঝানোর ক্ষমতায় ওর হাঁও বোজাতে পারব আশা করছি, এমন সময়ে সে বাধা দিয়ে বললো—'ছাখো, ঐ ছাখো !'

দেখলাম। ট্রামের মাঝামাঝি উপবিষ্ট দুজন লোক—একটি বেঁটেখাটো, আরেকটি বেতালা ঢ্যাঙা আর তাদের একজনের হাতে দুখানা ছিপ—হুইল টুইল সমেত। ছিপগুলি ট্রামের জানালার ফাঁক দিয়ে শূন্যপথে গলানো।

ইনি এ ..... বিনি এ

দেখলাম। এবং শুনলাম। শুনলাম একজনের নাম হরিশ, বেঁটেটার, আর ঢ্যাঙাটা হচ্ছেন গজেন। গজগজানি থেকেই গজেনকে বোঝা গেল।

আরো বোঝা গেল যে তারা মাছ ধরতে চলেছে। গজেন ছিপ দুটির তাল সামলাচ্ছে, হরিশের হাতে একটি থলে—খুবসম্ভব, সেই থলের মধ্যে এখন আছে মাছের চার, এর পরে অকুস্থলের ফেরৎ তা মাছের চারায় ভর্তি হয়ে ফিরবে।

আপনি কী হারাইতেছেন

দুজনেই মুহ্যমান। বিশেষ করে হরিশের অ-হরিষ একটু যেন বেশি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে—'কালকের আমারটা তেমন বড়ো হয়নি ভাই। মাত্র কয়েক হাতের।'

কয়েক হাত মাত্র? রুই না কাতল—কী বাবা? লোকটার হাতলের দিকে চেয়ে চেয়ে আঁচ পাবার চেষ্টা করলাম। কয়েক হাত, তবুও এত হতাশা? আমার অবাক লাগে।

'পরশুর আমারটাও তাই। হাত পাঁচেকের বেশি হবে না',—গজেনের গজালিও শোনা যায়।

কী বলে রে! কলকাতার মৎস্যজাতির সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় বেশি নয়। যেটুকু তাও নিতান্ত মৌখিক, কোনো ক্রমেই তাকে গভীর বলা চলে না। মুখের সম্মুখে যাদের দেখি—নিজের চোখে, নিজে চেখে দেখতে পাই, তারা লম্বা-চওড়ায় কখনোই দেড় দু ইঞ্চির বেশি নয়—তাও ঝালে ঝোলে অম্বলে কণ্টকিত হয়ে। গভীর জলের মাছের খবর—তাদের আকার প্রকার—হাবভাব আমার জানা নেই।

'শুনচো দাদা? শোনো শোনো।' বিনির উৎসাহ আর ধরে না। 'শোনো কান দিয়ে।'

বিনিকে শোনাতে হয় না। ট্রামের সবাই শুনছিল—হাঁ করে। মাছের খবর, তা রাষ্ট্র-ভাষায় মছলি করেই বলি, কিম্বা বিজাতীয় বাক্যে fish fish করেই বলা হোক, বাঙালীর কান খাড়া হয়ে উঠবেই।

ফিস্ ক্রমেই ফাঁস হচ্ছিল আরো।—'হ্যাঁ, তবে গত হপ্তারটা বরং একটু লম্বা ছিলো আমার। হাত পাঁচেকের হবে। কিন্তু তাই বা এমন কী আর!' হরিশ জানায়। খেদোক্তির মতই শোনায় কথাটা। হরিশে বিষাদ—আমাকেও বিষণ্ণ করে।

আপনি জানেন না !

কোথায় ছিপ ফেলতে যাচ্ছে এরা ? গোলদীঘিতেই কি ? সেখানকার মাছগুলো গোলগাল বলে শুনেছিলাম, কিন্তু এতটা লম্বা চওড়া হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। আমার গোল বাধে।

'তাহলে গত মঙ্গলবারের কথা বলি তোমায়।' গজেন বলে: 'দেখতে যদি আমারটা। এই সীজনে এইটেই আমার সববের বড়ো। প্রায় হাত কুড়িক লম্বা হবে—এই আমার হাতের।'

এই বলে গজেন আস্তিন গুটিয়ে তার দেড় গজি হাতখানা বের করে।—'কুড়ি হাত নেহাৎ খারাপ নয়—এই বাজারে ? কী বলো ?'

'খারাপ ? না, এমন খারাপ কী ?' মেনে নেয় হরিশ: 'এখনকার বাজারে ভালোই বলতে হয়।'

'কী বলে গো দাদা ?' বিনির ফিস্‌ফিসানি শুনতে পাই।

'মেছোবাজারের আমি কী জানি দিদি ?' আমি বলি।—'কতো-টুকুই বা জানি !'

'এই মন্দার বাজারে আর বিশেষ করে বছরের এই সময়টায় তোমার বরাতে কি করে যে এমনধারা বড়ো জুটলো আমি তাই ভাবি।' হরিশ ভাবিত হয়: 'কি করে জোটাও বলো তো ?'

'লোভ দেখাতে হয় হে ! বুঝলে বন্ধু, লুব্ধ হয়েই ওরা আসে।'

'তাই বটে ! লোভ দেখাতে পারলে বিশ বাইশ কি, পঁচিশ ত্রিশ হাতের একখানা টেনে আনাও কিছুই না।' সায় দেয় হরিশ।

আমার তাক লাগে আরো। অ্যাঁ, কোন্ মাছের কাহিনী বলছে এরা ? ইতিহাসবিশ্রুত রাঘব বোয়াল নয় তো ? রাম-রাজত্বের আমদানি শুনে রঘুবংশীয় শ্রীমৎসরাও দেখা দিতে সুরু করেছেন হয়তো বা ?

'এ সব বোধ হয় পুকুরের মাছ নয় দাদা ?' বিনি শুধোয়।

'মনে হচ্ছে গঙ্গার। গঙ্গায় মাঝে মাঝে সামুদ্রিক মাছরা হানা দেয় শুনেছি। তাই হবে হয়তো।' আমি জানাই।

সমুদ্রের মাছ আমি দেখিনি। কখন্ কোথায় ওরা দেখা দেয় আমি জানিনে। আমাকে না জানিয়েই তারা আসে। তবে সমুদ্রের যেমন আকার, তার মাছদের প্রকারও তেম্‌নি বিরাট হবার কথা। গজেন হয়তো আমাদের উপসাগরের খুব ডাগর কোনো মাছ ধরেছে। তার ঢেউই—মাছ-টাছ সব নিয়ে ওর গলায় উত্তাল হয়ে উঠেছে এখন। গজেনের সমুদ্রে সেই সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়।

'অবিশ্যি আমারও এক একদিন এমন গেছে হে। পঁচিশ ত্রিশ হাত লম্বা এক একটা আমিও পেয়েছি।' প্রকাশ করে হরিশ: 'অবিশ্যি আমি তোমার মতন হাত দিয়ে অমন মেপে দেখিনি, তা ঠিক। মাপতে আমার কেমন লজ্জা করে। লোকজনের সামনে—ছিঃ!'

'কেন, লজ্জা কী? লজ্জা আবার কিসের?'

'এই একটু কেমন চক্ষুলজ্জা। তবে হ্যাঁ, হাত দিয়ে না মাপলেও পাশাপাশি পায়ে হেঁটে পা দিয়ে মেপেছিলাম—সেই আন্দাজেই আমার বলা।' জানায় সলজ্জ হরিশ।

'পূজোর আগের কথা বলি তাহলে। একদিন আমারটা এত বড়ো হোলো যে — কী বলব। সে ভাই, হাতে পায়ে মাপবার নয়। কম করে ধরলেও পঞ্চাশ গজ!' গজরায় গজেন: 'তেমন বড়ো একটার তাল সামলানো কি সোজা রে দাদা? আমার কাম না। পুলিশ এসে ভার নিলো তার।' শুনে আমার মাথা ঘুরে যায়। বিনিও মাথা ঘোরায়: 'হাঙ্গর কুমীর নাকি গো দাদা?' ঘাড় ফিরিয়ে বলে।

'কী জানি দিদি! মকরবাহিনী মা গঙ্গাই জানেন!'

আপনি জানেন না !

'অমন বড়ো মাপের আমার বরাতে খুব কমই জোটে,' হরিশ দুঃখ করে : 'তবে দশ বারো হাত পর্যন্ত পেয়েছি আমি কোনো কোনোদিন। তুমি অমন বড়ো বড়ো টানো কি করে হে ?'

'রঙ দিয়ে ভোলাই। রঙীন কাপড়ের টুকরো দিয়ে।' গজেন রঞ্জিত করে : 'প্যারাস্যুট সিল্কের টানেও তারা আসে।'

বিস্ময়ের সীমা আমার আগেই ছাড়িয়েছিল। নাগরিক জীবন-ধারার সঙ্গে অভ্যস্ত সভ্য ভব্য আধুনিক মাছরা যে রঙচঙে ভুলবে—এ খবরে আশ্চর্য হবার কিছু ছিলো না। আমি অবিশ্বাস করিনে।

'আমার গুলো ভাই আটার ভূষি পেয়েই খুসি। চালে কাঁকর মিশিয়ে দিই—তাতেই আসে।...তাতেও আসে।' হরিশ সগর্বে জানায়। সর্বজন-সমক্ষে নিজের বাহাদুরি জাহির করে।

'চারের কথাটা মন দিয়ে শুনে রাখো।' বিনি আমাকে শোনায়। এতক্ষণে তার একটু চাড় দেখা দিয়েছে আবার।

'পূজোর সময়ের ওই আমার রেকর্ড বটে। কিন্তু পঞ্চাশ গজ আর কী এমন!' গজেনের গঞ্জনা : 'শীতটা এবার পেরুক না! তখন দেখো এসে। দেড়শো গজের একটা যদি না এনে খাড়া করেছি তো কী বল্লাম! এমন কি, আধ মাইল লম্বা হলেও আমি ঘাবড়াবো না।'

কিন্তু আমি ঘাবড়াই। মাছ-ধরুয়ারা লম্বা লম্বা মাছের কথা বলে বটে, কিন্তু সে কি এতই লম্বা? আর, সে-সব মাছ তো সেই সব—যারা ধরা পড়ে না—পালিয়ে যায় ফাৎনার থেকে—সেই সব অনুদ্ধৃত মাছ-দেরই স্ফীতকায় বলে প্রকাশ পেতে শুনেছি, কিন্তু এই মৎস-ধড়িবাজরা, এঁদের কথা শুনে টুনে যতদূর আমার ধারণা হচ্ছে, হৃত নয়, ধৃত মৎসের বার্তাই জানাচ্ছেন।

তাহলে—তাহলে কি তিমি মাছের কথাই এঁরা বাৎলাচ্ছেন নাকি ?

কিন্তু, এভাবে আর 'তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে' হয়ে থাকা যায় না। স্তিমিত ভাবটা কাটিয়ে আমি উঠি।

সামনে গিয়ে দাঁড়াই। —'মশাইরা, মাপ করবেন। কোন্ অতিকায় মাছের কথা আপনারা বলছেন জানতে পারি কি ? দয়া করে যদি জানান···'

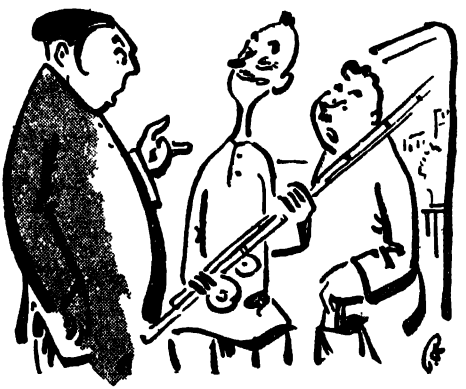

মৎসপ্রদেশের কথাই নয় !

গজেন ফিরে তাকায়। 'মাছ ? মাছের কথা কে বল্‌ছে মশাই ?' সেই উল্‌টে শুধোয় আমাকে। আমাকেই।

'মাছ নয়, তবে এত লম্বা লম্বা কথা কিসের ?' আমিও সহজে ছাড়বার ছেলে নই।

'আমার বন্ধু, এই হরিশ।' সে বলে—'এ রেশন-শপে কাজ করে। আর, আমার হচ্ছে কাটা-কাপড়ের দোকান। মাছের কথাই নয়। কার দোকানের সামনে কতো বড়ো কিউ দাঁড়ায়—সেই আলোচনাই হচ্ছে আমাদের।'

আঠারো

'আপনি দেখতে ঠিক আমার ভাগনির মত। অবিশ্যি, ক্ষণিকের দৃষ্টিতেই।' দৃষ্টি সম্বরণ করে আমি বল্‌লাম।

কোনো জবাব দিল না মেয়েটি। একটু যেন চমকিতই হয়েছে মনে হোলো।

এই মেয়েরা—বাস্তবিক! এদের চেনা এতই কঠিন। এই সরল বাক্য দ্বারা আমি কোনো দুরূহ তত্ত্বের বোঝা নামাচ্ছিনে, সাদা কথায় সোজা কথাই বোঝাতে চাচ্ছি। দেবা ন জানন্তি-র উদ্ধৃতিসূত্রে স্ত্রী-চরিত্রের গূঢ় রহস্য নিয়ে টানাটানি আমার নয়, হাড়ে হাড়ে চেনার কোনো কথা না, এম্‌নি মুখ দেখে ধরতে পারাই কতো মুস্কিল সেই কথাই বলছিলাম।

এই মেয়েটিকেই ধরা যাক্! এক টেবিলে এখন আমার পাশের আসন আলো করে বসে আছেন—হঠাৎ দেখলে মনে হয় আমাদের প্রিসিলাই। চম্‌কে দেয় আচম্‌কা। অচেনা এক যুবকের সাথে কফি-হাউসে ওকে দেখা যাচ্ছে বলেই যে চমকানো তা নয়। অবিকল প্রিসির মত দেখতে বলেই আমার এই চমক্।

আশ্চর্য, একমুখ ওর প্রিশীলতা। সেই মুখ, সেই হাসি, সেই চটুল চাউনি—সব। হাসলে প্রিসির মত ওরও এক গালে টোল খায় দেখেছি। আড়াল থেকে হাসি দেখতে গিয়ে তাও দেখলাম। সেই সাথে ওধারের নিটোল গালটাও আমার নজর এড়ায়নি। কিন্তু তাহলেও—প্রিসির সঙ্গে ওর বৈলক্ষণ্যটাও লক্ষ্য না করবার মতো নয়।

'ক্ষণিকের দৃষ্টিতে—তার মানে?' সঙ্গী যুবকটি শুধালো।—'সর্বক্ষণই তো উনি এইরকম! সর্বদাই এঁর এইরূপ।'

'যদ্দিন ধরে দেখছি, এইরকমই দেখতে—একরূপ।' একথাও জানাতে কসুর করলো না।

'প্রথমটা দেখে আমার মনে হয়েছিলো বুঝি বা আমাব ভাগনি। সে একটুক্ষণের জন্যেই। সেই জন্যই আমি তাকিয়েছিলাম।'

'আপনি কি সর্বদাই আপনাব ভাগনির দিকে হাঁ করে—আই মীন্—এম্‌নি ড্যাব্‌ডেবে চোখে তাকিয়ে থাকেন নাকি?'

রহস্যময়ী

'না, না। তা কেন?' তাড়াতাড়ি বলতে যাই, 'তা কেন তাকাতে যাবো? তবে একটু তাকিয়েই আমি বুঝতে পারলাম যে, না, আমার ভাগ্‌নি নয়।'

'কি করে বুঝলেন?'

'আমার ভাগ্‌নির সঙ্গে মিল আছে যেমন তেম্‌নি গরমিলও রয়েছে—'

'মিলের দিকটা শুনি আগে।'

আপনি জানেন না !

'হাসলে আমার ভাগ নির এক গালে টোল খায়, লক্ষ্য করলাম এঁরও তাই।' জানাতে হোলো আমায়।

'টোল দেখলেই কি আপনি এমনি টলে পড়েন ?'

'তা, টোলবিশেষে পড়লেও তো পড়া যায়। পড়া যায় না ?' বলতে হয় আমায়—'ধরুন, যদি সংস্কৃতের টোল হয়, বাধা কি পড়বার ?'

'সংস্কৃতের টোল আর সুন্দরীর টোল—আলাদা রকমের পাঠশালা মশাই ! সেটা স্মরণ রাখবেন।' ছেলেটি জানায়।

'ধাক্কা সমান। টাল সামলাতে হয় দু জায়গাতেই।'

সত্যি সত্যি, ভালো করে ভাবা যায় যদি, শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, সন্ধি-বিচ্ছেদ, লট্-লোট্-বিধিলিঙ ইত্যাদির জ্ঞান না থাকলে-যে-টোলেই পড়িনা কেন, পড়তে যাই না—শেষ পর্যন্ত হালে পানি মেলে না। পানিনির সূত্রের মতো পানিগ্রহণের সূত্রপাতেই বাধা আসে।

'যে-টোলেই পড়ুন, যত্ব-ণত্ব-জ্ঞান থাকলে আর টাল খেতে হয় না, বুঝলেন মশাই ? এখন—জেনে রাখুন, এই মেয়েটির সর্বসত্ব সংরক্ষিত।' জানালো সে : 'যাক্, এবার গরমিল্‌টা কোনখানে জানান্ তো ?' জিগেস করে সে অবশেষে।

'তিলমাত্রই। তিলেকের মাত্র। আমার ভাগ্‌নির সঙ্গে শুধু এক তিলের তফাৎ এঁর। তার বেশী নয়।'

এই আমি বলি। এবং এর বেশী বলি না। টোলায়মান গালের অন্যদিকে—যে-ধারটা অটোল—সমস্ত হাসির তরঙ্গভঙ্গেও অটল—সেই গালটায় ছোট্ট একটু তিল। ঐ তিলটুকুর জন্যেই আমি তাল সামলাতে পেরেছি। আমার ভাগনিত্ব থেকে বাতিল করতে পেরেছি ওকে।

অবিশ্যি, নিজের মুখপত্রে সামান্য একটা তিলের ছলনা—এই সুলভ

সম্পাদনা করা যে আধুনিকা প্রিসিলার পক্ষে একেবারেই অভাবনীয় তা আমি ভাবিনে, কিন্তু ঐ একতিলের গরমিলই এক তাল হয়ে ওঠে—হতে পারে—তার সঙ্গে যদি আবার এক বেতাল থাকে। তাল-বেতালের সঙ্গে সমানে লড়বো এতো বড়ো বিক্রমাদিত্য আমি নই।

একতাল সিগ্রেটের ধোঁয়া আমার নাকের ওপর ছেড়ে সে বলে—'কিন্তু মশাই, এই সামান্য তফাৎটুকু খুঁজে বের করার জন্যে আপনি এক অচেনা মুখের দিকে অতোক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন—এই বা কেমন ধারা?' বেতাল আমাকে সহজে ছাড়বার না।

'কিন্তু না তাকালেই বা কি করে আমি টের পাবো বলুন তো?' আমারো জিজ্ঞাস্য।

'টের পাবার দরকার আপনার? দুনিয়ার সব মেয়েই কিন্তু আপনার ভাগ্‌নি নন? শুধু একজন বাদে—আর সবাই আপনার নন্‌-ভাগনি? আর সেই একজন তো এই নারীসমুদ্রে একটি বুদ্বুদ মাত্র—একটি বুদ্বুদের খোঁজে আপনি বিশ্বের নারীর মুখশ্রী-পারাবারে হাবুডুবু খাবেন—বেশ মজা তো।'

শোনো আনাড়ির মতো কথা। আমি মাথা নাড়ি—'তার মানে?' এর মধ্যে মজার কী আছে—মজানোরই বা কী—আমি তো বুঝিনে।

'তার মানে—সেই একটি মেয়ে ছাড়া আর সবাই হচ্ছে আর সবাই।' বেতাল আমাকে বাৎলায়।

'বুঝলাম না।' আবার আমায় ঘাড় নাড়তে হোলো।

'এই ধরুন, আমি। আমি একটা লোক। কেমন তো?' এই বলে আবার সে ধোঁয়া ছাড়ে: 'আমি একটি লোক, একমাত্র। আমার মত লোক শুধু একজনই আছে। সে হচ্ছি আমি। কেমন, তাই

তো ?' তারপর আরো তার ধোঁয়া ছাড়বার পর—'তাহলে, দাঁড়ালো এই যে, আমি অদ্বিতীয়। আমার মত লোক আর দ্বিতীয় নেই। ঠিক হোলো ? আমি—আমি। এই মেয়েটি আমি নই। কেমন, ঠিক তো ? তাহলে, এই মেয়েটি হচ্ছে এই মেয়েটি, এর মতন দ্বিতীয় আরেকটি আর নেই। থাকতে পারে না। বুঝতে পারলেন এবার ?'

এমন ধোঁয়াটে কথার মর্ম বোঝা আমার কম্মো ? নাকের মধ্যে সেঁধুলেও মগজে এসব সহজে ঢোকে না।

'কিন্তু আমি যদি কারু দিকে না তাকাই তাহলে সে আমার চেনা কি অচেনা তা আমি বুঝবো কি করে ?' মাথা চুলকে আমি বলি—'জানবো কি করে যে তারা আমার চেনা কি চেনা নয় ? আমি যে তাদের চিনি না তাই বা কি করে মালুম হবে শুনি ?'

'কিসের মালুম ?'

'যে আমি তাদের চিনি না।'

'চেনেন না তো তাকাবেন কেন, তাকাতে যাবেনই বা কেন তাহলে ?'

'তাক্ পাবো কি করে তবে ?' আমি বলতে যাই—

'পরের তাকে হাত বাড়াবার আপনার দরকার ? ৎ.ক্ না তার একগাল টোল—সে তো আপনার নাগালের বাইরে ?'

'নাগালের বাইরে বলেই বামন কি চাঁদের দিকে তাকায় না ?' আমার মুখ ফস্‌কে বেরোয়—'তাকাতে নেই কি তার ? তাকালে কী হয় ?'

ফস্‌কাতে দিই মুখ। ইচ্ছে করেই। আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়ে মেয়েটি উসখুস করছিলো তখন থেকেই। আলোচনার বিষ-ভাগটা যাতে না লাগে, সেই জন্যে চোনাটুকু বাদ দিয়ে চাঁদের থেকে কিছুটা আলো এনে অমিয় ছেনে ধূম্রজালের ওপর জ্যোৎস্নাবৃষ্টি করার এই সাধনা আমার।

আপনি কী হারাইতেছেন

'হায়নাও তো চাঁদের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে। করে না কি?' বেতাল ধুঁইয়ে ওঠে—'কিন্তু পায় কি?'

'তার মানে?' ধোঁয়ার তাড়নায় চোখ আমার ছলছল করে।

'মানে এই, আপনি তো চাঁদ নন। যদ্দুর আমার ধারণা।'

'তবে কি আপনি বলতে চান যে আমি একটি হায়না? এই কথাই আপনি বলতে চান?' এবার আমার রাগ না হয়ে পারে না।

'হায়না কেন হবেন? কেন, বেড়ালরাও চাঁদের দিকে তাকায় না? ত্যাখেননি তাদের তাকাতে?' তারপর আরেক ঝলক ধোঁয়া।

'তার মানে? কী বলতে চান আপনি শুনি? তার মানে আমি হায়না নই, আমি হচ্ছি—' বলতে গিয়ে চেপে যাই। ইস্, একেক সময়ে নিজেকে ব্যক্ত করা এমন শক্ত ব্যাপার! প্রায় বেডার ওধারে গিয়ে পড়েছিলাম আরেকটু হলেই।

সত্যিই, নিজেকে উন্মুক্ত করা সহজ নয় মোটেই। খালি সোহংতত্ত্বই নয়, নিজের সামান্যত্বও নিজমুখে ফুটিয়ে তোলা দুরূহ। ভগবানের আত্মপ্রকাশের বাধা কোথায় বোঝা যায় এখন।

'আপনি হায়না, কি হায়না না সে-সম্বন্ধে আমার কোনই মতামত নেই। আমি হায়না কখনো দেখিনি।'

'তাহলে—তাহলে আমি বেড়াল?' বেড়া টপ্‌কাতে হয় আমায়।

'সঠিক বলতে পারিনে। ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি তো। অচেনা লোকের প্রতি তাকানো আমার—'

'দরকার করে না ভালো করে তাকাবার। একটু দেখলেই বোঝা যায়।'

'ঠিক কথা। তাহলে আমার সঙ্গিনীর দিকেও বেশিক্ষণ দৃকপাত করার কোনো হেতু ছিলো না আপনার।'

আপনি জানেন না !

'আমি ভেবেছিলাম যে আমার ভাগ নি।'

'কথা পালটাচ্ছেন। আপনি বললেন যে আপনার ভাগ্‌নি নয় সে-বিষয়ে সঠিক হবার জন্যেই আপনি—'

'তাকিয়েছিলাম। ঠিক কথা। এবং তাকাবার পরেই সঠিক হলাম।'

'কিন্তু আমি এ বিষয়ে সঠিক ছিলাম আগাগোড়াই।' পঞ্চবিংশতি-বারের মত কিনা জানি না, বেতাল নিজের বক্তব্য বলে :—'ইনি যে আপনার ভাগনি নন একথা আমি জানতাম—এমন কি, আপনার এখানে পদার্পণের পূর্বেই। ওঁর দিকে তাকাবার আগেই। আপনার মত ভদ্র-লোকের ভাগ্‌নি হবার মতন দুর্ভাগ্য নিয়ে ইনি আসেননি পৃথিবীতে।'

'এও সঠিক জানেন ?'

'হ্যাঁ, এবং এও জানি যে ইনি আমারও ভাগ্‌নি না। কোনো আত্মীয়া-টাত্মীয়াই নন্ আমার। আর, সেইখানেই এঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা। সেইজন্যই। পারিবারিক কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলেও ইনি আমার পরমাত্মীয়। কোনো আত্মীয়তা-সূত্রে নয়, পরমাত্মার সম্পর্কে।'

'বুঝতে পেরেছেন বেশ ?'

'দেখুন, সত্যি বলতে, মেয়েদের কি ঠিক ঠিক বোঝা যায়? বুঝতে পারে—চিনতে পারে কি কেউ ? কখনো কি পারে ? তবে একথাও সত্যি যে, হয় তারা পরমাত্মীয়, নয় তারা কিছুই নয়। আর, সেটা লৌকিক সম্বন্ধে নয়, লৌকিকতার টানে না, অলৌকিক সম্পর্কে। পরমাত্মার সম্পর্কেই। আত্মীয়তা-সূত্রের কোনো জোর নেই এখানে—কিচ্ছু মানে হয় না—এই মেয়েদের বেলায়।'

প্রচুর ধোঁয়ার মুখে বেরিয়ে এলেও, কথাটা ভাববার মতই। আলোর আভাস ছিলো বুঝি কথাটায়। আমি ভাবি—ভাবতে সুরু করি।

আর ভাবতে গেলে, ভাবের কথাতেও, আমার খালি অভাবের কথাই মনে আসে। মনে পড়ে পরমাত্মাও, আসলে, পরমাত্মীয় নন্। তিনিও পরাৎপর। পরের চেয়েও পর আরো।

রহস্যভেদ

আর মেয়েরাও তাই। ঠিক পরমাত্মার মতনই। নিজগুণে আর নিজের রূপে ধরা না দিলে, ধবে কাব সাধ্যি? এমন কি, নিজের সাধ্বী স্ত্রীও যদি অন্যমূর্তি ধরে—ঐরূপ তিলোত্তমা হয়ে—সম্পূর্ণ অচেনা আরেক যুবকের সাথে চোখের ওপরেই ঘোরেন, তাকে ধরতে পারে এমন ঘোড়েল ভূভারতে কেউ আছে আমি মনে করিনে।

আর, বিধাতাও তো—ঠিক মেয়েদের মতই। বরং এক কাঠি জেয়াদা। চিনবো যে তার তিলমাত্র চিহ্নও রাখেননি তিনি কোথাও। এইজন্যই বুঝি আমাদের বিধাতা অর্ধনারীশ্বর—আর অর্ধেক নরেশ্বরী। সাক্ষাৎ ভগবতীই তিনি।...

চিন্তাজালে জড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছি, এমন সময়ে মেয়েটি বলে ওঠে—'রুচিন্‌বাবু, থামুন তো। মেজমামা, ইনি হচ্ছেন রুচিন্‌বাবু। রুচিরিন্দ্রবাবু—যাঁর কথা তোমাকে বলেছিলাম না আগে? সেই আর্টিস্ট—ইনিই। এই ভদ্রলোক।'

উনিশ

অনেক ছেলের সঙ্গে ভাব, অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব। কিন্তু ধার করে করে কি অভাব মেটে? যদিও শুধু ছোরাছুরিরই নয়, সৌহার্দের পরীক্ষাও—ঐ ধারেই; তাহলেও এই করাতের মতন বন্ধুত্বদের যেতে আসতে কাটা, কাটতে কাটতে কাটিয়ে যাওয়া, আমার পক্ষে যাই হোক, আমার হতাহতদের বরাতে হয়তো ভালো নয়।

তাই ভাবলাম, অনেক ছেলের সঙ্গে ভাব, অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব। এদের পরস্পরের অভাব মোচন করে যদি কিছু করা যায়—দুপয়সা হয় তো মন্দ কি? সেই উপায় দেখা যাক্ না? একটা বিবাহ-প্রজাপতি-আপিস খুললে কেমন হয়?

প্রিসিলা বল্লে, সে আমায় সাহায্য করবে।

বিনি কিন্তু মুখ ব্যাঁকালো—লেখক থেকে ঘটক? তবে আর বাকী কী রইলো দাদা!

আমি বল্লাম—কেন, ঘটক কেন? প্রজাপতির প্রতিনিধিত্বই তো? আর, প্রজাপতিগিরির চাইতেই বা কম কিসের? ভেবে দেখলে তেমনি উড়তি তেমনি ফুর্তিরই কাজ। এবং প্রজাপতি কি বিধাতারই আরেক মূর্তি নয়? সেদিন এক উপন্যাসকারের কবুলতিতে পড়ছিলাম আমরা লেখকরা নাকি বিধাতার সগোত্রই? নিতান্ত কেউকেটা নয়। তিনি যেমন সৃষ্টিকর্তা, আমরাও তেম্‌নি স্রষ্টা—স্রষ্টা ছাড়া আর কী আমরা?

ওর মুখ-ব্যাঁকানার ওপর আমার ব্যাখ্যানা তো ছাড়ি, কিন্তু বলতে কি, আমার নিজেরই কেমন খট্‌কা লাগে।

আপনি কী হাবাইতেছেন

নিজেকে স্রষ্টা বলে ভাবতে পারিনে। বরং ইঞ্জিনিয়ার বল্লেই যেন ঠিক হয়। কিম্বা, ওভারসীয়ার আখ্যা দিলেই—আরো যুতসই হয়। মজবুতসই হয় আরো।

মাটি জল আকাশ গাছপালা পাহাড়—এসব মৌলিক রচনা আমার নয়, এর থেকে বানানো কি বাগানো ইঁট কাঠ পাথর খোয়া চূণ বালি শুরকি সিমেণ্ট এসব—এ সবও অপরের, খালি সেই সব জড়ো করে জমাট করে জোড়াতাড়া লাগিয়ে নিজের মনের মতো ইমারৎ গড়াটাই আমার। খোদার উপরে খোদকারিও বলা যায়। অপরের সৃষ্টি-ক্রিয়ার মধ্যে আমার দৃষ্টিক্রিয়া। এক রূপের ভেতব থেকে অন্য রূপকে টানা, অপরূপকে আনা। এক রূপকে অন্য রূপে দেখা—অনন্যরূপে দেখা। দেখানো। এই, এই তো আমার।

ব্রহ্মা যেকালে নিজের ডিমে তা দিয়ে ছানা আনান, আমি সেকালে গোরুর দুধের থেকে (তাও আবার গোয়ালীব সৌজন্যে) আমার ছানা বানাই। তফাৎ এইখানেই।

গোরু বিধাতার আর দুধ গোয়ালার আমদানি। শুধু সেই অমিয় ছেনে, ছানতে গিয়ে, যেটুকু গরল আর ভেল, সেইটুকুই আমার। আর এর গরহজমিটাও। ভেল্কিটাও হয়তো।

তফাৎ এই, প্রজাপতি যে কাজ পঞ্চশরের সাহায্যে ঘটান, আমাকে সেখানে কণ্ঠস্বরের সাহায্য নিতে হবে। তিনি যেকালে অভাবিত দুজনকে মুখোমুখি এনে গেঁথে দেন, সেখানে আমাব গাঁথনি হবে পরস্পরকে ভাবিত করে'—প্রভাবিত করে'। তাঁর বেলায় ঘটাই খালি, আমার বেলা ঘট্‌কালি। (কিন্তু তাঁর দয়ায় যেটা পক্ষপাত, আমার পক্ষে সেটা পক্ষাঘাত হবে, তখন কি আর তা জানতাম ?)

তাছাড়া, ভেবে দেখলাম, বিজ্ঞাপনে আমার মাথা খ্যালে ভালো এবং বর-কনেরা একালে আর সেই পণ্য দ্রব্য নেই—পণ দিয়ে আপন করার নয়। বিজ্ঞাপন দিয়ে আদায় করবার। আর, বিজ্ঞাপন দিতে আমি ওস্তাদ।

আমার বিবাহ-ঘটক-আপিস বিজ্ঞাপনের জোরেই চালিয়ে দেব। বিজ্ঞাপন আর বিয়ে—দুই আদিতে বি নিয়ে—ব্যাধির মতই প্রায়। এক বিকারের ওপর আরেক বিকার টেনে আনা কঠিন হবে না—সান্নিপাতিকের বেলা যেমন হয়। নারী আর আনাড়ী নিজগুণেই মিলবে, কেউ যদি যোগাযোগ না করে তাহলেও। তারি মধ্যে বুদ্ধি করে কেউ যদি তাদের সারি সাজিয়ে যোগ কষে—যোগাতে পারে কেউ— যোগফল তার মারে কে ?

ইনিয়ে বিনিয়ে বললাম বিনিকে। সে ঠোঁট ওল্টালো—'কেউ তোমার প্রজাপতি কার্যালয়ের ছায়া মাড়াতেও আসবে না। মেয়েরা তো নয়ই। তারা তোমার আঁক না যে—'

আমি বাধা দিয়ে বলি—'মেয়েরা আঁক নয় ? বটে ? কে বলেছে ? আঁকের মূল রহস্যই তো ওরা। ওদের মধ্যেই যতো আঁক। তা না হলে মেয়েদের অঙ্কশায়িনী বলেচে কেন ?'

এক-কে শূন্য করা, একককে একা না রাখা, ত্রিশূন্যে—ত্রৈরাশিকে টানা—শূন্যের থেকে আরেক আনা, অনেক আনা—এমন সব শক্ত শক্ত আঁক—যার কিছুটা লৌকিক, কিছুটা-বা অলৌকিক—এসব কার কীর্তি ? কাদের কারু ? আর কারু না, মেয়েদের।

প্রবেশিকা পরীক্ষার, কি, জীবন-নাটকের—ওরাই যতো অঙ্ক। প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে ত্রয়াঙ্ক পঞ্চাঙ্ক গর্ভাঙ্ক সব জড়িয়ে পটক্ষেপ

পর্যন্ত—মিলনান্ত বিয়োগান্ত প্রাহসনিক। অঙ্কের খাতায় বা জীবনের পাতায় এ-আঁক কখনো মেলে, কখনো মেলে না—কখনো বা মিলবার নয়। কিন্তু আমাদের যত আঁকুবাঁকু শুধু তাই নিয়েই।

কিন্তু এসব তত্ত্বকে ঘাঁটিয়ে তুলতে হোলো না, প্রিসিলাই মিটিয়ে দিলো—'তুমি কিচ্ছু ভেব না মেজমামা। আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি তোমার সেক্রেটারির কাজ করবো। হোলো তো? খোলো তোমার আপিস।'

বসা গেল আপিস খুলে। কাগজে কাগজে ঢাক পিটে জানান্ দেয়ারও কসুর হোলো না। কিন্তু কোথায় কে! ভাবা গেছল, সিনেমার টিকিট-ঘরের লাইনের মতই ছেলে মেয়ের গাঁদি লেগে যাবে, কিন্তু কারো টিকিটিরো দেখা নেই।

এম্‌নিতে যারা বাড়ি বয়ে আড্ডা দিতে, ভাব জমাতে আসতো, তাদেরও অভাব দেখলাম। বাড়ি বাড়ি সফর করে—ফরফর করে বেড়ানোই কাজ ছিলো যাদের, সেই সব সফরীরাই বা গেল কোথায়! গায়ে পড়ে এঁড়ে তর্ক করার পেশা নিয়েছিল যারা, তারাও যেন এ-পাড়ায় নেই। কোন্ মুল্লুকে উধাও হয়েছে! অন্তত, চুণোপুঁটিদেরও ভিড় হবে আশা করেছিলাম—কিন্তু তারাও যেন গভীর জলে তলিয়ে গেল।

এমনিই হয়। প্রেমের ফাঁদ সারা ভুবনে পাতা, কিন্তু সেকথা মনে থাকে না বলেই ঝপাঝপ্ পড়ে সবাই—পড়ে' দেহপাত প্রাণপাত করে। তারাই ফের ধরাবাঁধা পথে জেনেশুনে এগুতে হোলে আগুপিছু করবে। ঘোড়া এমনিতে বেশ জল খায়—ঘাড় নীচু করে'—অধোবদনেই—কোনই বাধা নেই—কিন্তু তাকে জলের ধারে নিয়ে যাও ধরে—খাবার জন্যে

সাধাসাধি করো—অমনি তার রুক্ষমূর্তি ! অম্‌নি তিনি সামনে দু-পা রুখে (বা শূন্যে তুলে) বেঁকে দাঁড়িয়েছেন।

সাধ্যসাধনায় সামান্য ঘোড়াই যেকালে পানি-গ্রহণে বিমুখ, সেখানে জোরালো তাগিদ্ দেখলে পরির-মতন-মুখ পাত্রীরা—পরের প্রতি উন্মুখ পাত্ররা ব্যাপারটাকে পাণিপথের লড়াই জ্ঞান করে যদি পরাঙ্মুখ হয়ে পিছিয়ে পড়ে, ঘোড়েলের মতই আচরণ করে যদি—এমন কিছু বিস্ময়ের হয় না। সবাই কিছু ঢেঁকি নয়, অন্ততঃ সবসময়ে নয়, যে অনুরোধ করলেই গিলতে রাজি হবে। এক ঢোঁকেই—বলামাত্তর ?

এখানেও বুঝি সেইটেই ঘটলো। ইঁদুর-কল পাতার খবর টের পেয়ে হবুবরেরা বিবরে সেঁধুলো নাকি ! আর কনেরা ? তারা যে কোন্ কোণে গিয়ে লুকোলো—কোথায় উপে গেল, কেউ জানে না !

আমার আপিসের বেড়ার ধারে-কাছেও এলো না কেউ। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে বুঝি ছেঁড়ে না—শিক্ষে হয়েছে বেশ—

খোদার কাজের সঙ্গে আমার খোদাই-কাজের ফারাক্‌টা কোথায়, টের পেয়েছি খুব। দেমাক গেছে আমার। বুঝেছি যে, তাঁর হচ্ছে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া। আর, আমার এই অপটন-পটন-ঘটিয়সী বিদ্যে—তার ছায়ার ছায়াও নয়।

এইভাবে হতাশ হয়ে যখন হাল ছাড়তে বসেছি—হালের বিজ্ঞাপনটা ছাড়তে যাচ্ছি—এমন সময়ে—

এমন সময়ে এক সুবেশ যুবক আমার কার্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোলো—

'দেখুন, আমি একটি মেয়ের খোঁজে এসেছি—', পা দেবার সাথে সাথেই তার কথা পাড়া—'এমন একটি মেয়ে, যে লম্বায় হবে পাঁচ ফুট—এই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি—কি সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি নয়,

মানে, আমার চেয়ে তেমন খাটো নয় বিশেষ। প্রায় আমার মাথায় মাথায়, আমার সমান সমান, এমন একটি পাত্রীর সন্ধান আপনি আমায় দিতে পারেন ?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান।' আমার তর্জনী খাড়া করি—পেন্সিল বাড়তে গিয়ে আঙুলের ডগাটা চেঁছে ফেলেছিলাম সেইদিনই—'ব্যস্ত হবেন না। বসুন আগে। দেখচেন আমার আঙুল ?' অঙ্গুলিহেলনে ওকে বসতে বলি। —'আঙুলের অবস্থা দেখচেন তো ?'

উনি ছাখেন। আঙুলের জলপটির ওপর আর কথার পট্টি মারার দরকার করে না—

'দেখচেন তো ? সমস্ত পার্টিকুলারস লিখতে হবে আপনার। দুটি পার্টিকে একটি কুলায়ে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। আমার এই আহত আঙুলে কুলাবে না। আমার সেক্রেটারিকে ডাকি আগে।'

ডাকলাম প্রিসিলাকে।

প্রিসিলা এলো। বের করলো রেজিস্টারি বই। বিবাহ-ঘটক-আপিসের প্রথম ঘটনা লিপিবদ্ধ হতে থাকলো।—

'হ্যাঁ, কী রকম মেয়ে চাই বললেন ? ক' ফুট ক' ইঞ্চির ?'

'বড় জোর, সাড়ে পাঁচ ফুট— প্রায় আমার সমান ঘাড়ে। মানে, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সব দিক দিয়েই প্রায় আমার সমান। আমার চেয়ে লম্বাও না, খাটোও না তেমন। মানে, বউকে নিয়ে যদি রাস্তায় বেরুতে হয়, বাড়ির মধ্যেই না বেঁধে রাখি, তাহলে—বুঝতেই তো পারচেন— ?'

বোঝার কোনোই অসুবিধে হয় না। ঈষৎ খাটো মেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরুলে ততটা বিসদৃশ দেখায় না, বেড়াতেও তেমন বেয়াড়া নয়, কিন্তু সঙ্গিনী নিজের চেয়ে লম্বা হলেই হয়েছে! ভারি মুশকিলের

ব্যাপার। ঘাড়ের সে-এক বাড়তি খাটুনি। বিশেষত, আমার মতন লোক—যারা মুখের মতন চায়—পথ-চলতি যাদের মুখ চলে—যারা যেতে যেতে খায়, আর খেতে খেতেই যায়—তাদের চীনেবাদাম, চকোলেট ইত্যাদির অনুসঙ্গে রমণীয় তনুসঙ্গে আরো সব চমৎকার খাবারের দিকে লোভ যেতে পারে। খাওয়াটা তো রাস্তাতেই বেশি মুখরোচক? এমন কি, যে-জিনিস মানুষ স্থির হয়ে খায় এবং খেলে স্থির হয়ে যায়, সে-জিনিসও দেখা গেছে, পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনার মত পথে পেলে তার ন্যায় উপাদেয় আর নেই। সেই উপ্‌রিলাভের হিসেব হয় না।

প্রি-শিলালিপি !

'সে কথা ঠিক।' সায় দিই আমি—'স্ত্রী যদি নিজের কক্ষে থাকেন, কোনোই গোল নেই, কিন্তু তাঁকে যদি কক্ষ্যুত করতে হয়—সহচরী বানাতে হয় যদি—তাহলে সমকক্ষ মেয়েই সব-চেয়ে ভালো—সর্বদা বাঞ্ছনীয়।'

প্রিসিলা লিখলো—'পাঁচ ফুট সাড়ে ছ' ইঞ্চি—ঘাড়ে-গর্দানে সমান—'

ছেলেটি গর্দান নাড়লো—'হ্যাঁ। দেখতে তেমন আহামরি না হলেও চলবে, তবে হ্যাঁ, তাকিয়ে যেন তাকে দেখা যায়। দেখলে

চোখ ফেরানো যায় না, এরকম যদি নাও পাই, দুঃখ নেই, কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই আঁৎকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে এমনটাও যেন না হয়।'

'স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা কষ্টকর নয়।' আমি বল্লাম।

প্রিসিলা লিখলো—'দেখনসই'।

'কাল্‌চার্‌ড্‌ মেয়ে চাই আমার।' ছেলেটি জানায়—'এমন মেয়ে চাই আমি—যার নিজের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে।'

'সুদুর্লভ। এমন মেয়ে সাতিশয় বিরল। 'কাল্‌চার' কাকে বলে আমি জানিনে,—' আমি বলি: 'তবে কারো কারো, বিয়ের দৌলতে, নিজের ব্যক্তি থাকলেও, নিজের ব্যক্তিত্ব বলে মেয়েদের কিছু নেই।'

'নিজের অভিব্যক্তিত্ব।' প্রিসিলা নিজের মতন করে লেখে।—'নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারা। মেয়েটির আপনাকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা থাকবে এই তো আপনি চাইছেন? তাই না?'

'ঠিক তাই। কিন্তু কাল্‌চারটাও চাই। কাল্‌চার কাকে বলে আমিও ঠিক জানিনে, বোঝাতেও পারবো না আপনাদের—কিন্তু ও না হলে চলবে না। কাল্‌চার মানে—এই রকম—এই যেমন এসেন্সের মতন কেমন একটা গন্ধ-গন্ধ ভাব—যা আজকালকার মেয়েদের সব-কিছুর সঙ্গে আল্‌তোভাবে জড়িয়ে থাকে। জড়োয়া গহনার মতই অনেকটা। কিন্তু চোখে দেখা যায় না, নাকে লাগে।...মনের নাকে।'

'সব-কিছুর আমসত্ব।' এক কথায় আমি সারি।—'চোখে দেখা যায় না, চেখে দেখবার।...'

'মনের জিভে।' প্রিসিলা মনে করিয়ে দেয়। জীবের প্রতি দয়াবশেই, মনে হয়।

'হ্যাঁ—' বলতে গিয়ে আমিও উজ্জীবিত হই—'আর, গয়নার মত গায় জড়িয়ে থাকে না, ছড়িয়ে যায়। ছড়াতে ছড়াতে যায় সব জায়গায়।'

'আপ্ টু ডেট্।' প্রিসিলা লেখে। তারপরে প্রিসিলার আরও সংক্ষেপ। —'এককথায়, ঢং।'

'কথাবার্তায় দড়। সু-রসিকা। বোধশক্তি আছে। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।'

'ক্যালিফোর্নিয়ার যেন বড্ডো বাড়াবাড়ি হচ্ছে? একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' আমি বাধা দিয়ে বলতে যাই। ভূ-ভারতে এমন মেয়ে মিলবে কোথায়!

'এবং তাজা। ভোর বেলার পদ্মর মতই টন্‌কো। বেশ উৎফুল্ল সর্বদাই। সব সময়েই হাসিখুশি। এমন কি, সকালে যখন বিছানা ছেড়ে উঠবে, তখনো—তখনো তার মুখভার নয়। ঠিক যেন ফুটন্ত গোলাপ কুঁড়ির মতই বিকশিত।...'

'সব সময়েই বিকশিত—দাঁতের দিক বাদেও।' আমার অনুবাদ।

'কুঁড়ে নয়, কুঁড়ি।' ও লেখে।

'আমি যখন আপিসে যাবো, তখন সে হাসিমুখে আমায় বিদায় দেবে, ফের আবার আপিস থেকে ফিরবো যখন, তখন তাকে আমি দেখতে পাবো বাতায়নে। আমার জন্যে অপেক্ষমানা।'

'লেখ্ তটস্থ।' আমি বললাম।

'ওস্তাদ্।' আরো শাদা বাংলায় ও সিধে করে।

'কালিদাসের যুগের কথা জানি নে। তবে আজকাল এ ধরনের মেয়ের দেখা মেলা খুব ভার।' আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস পাড়ি।

আপনি কী হারাইতেছেন

'মানতে পারলুম না মশাই। এমন মেয়ে মেলে না, কী বলেন? মেলাই! মে—লাই!! এরকম মেয়ে আক্‌চার আজকাল। আপনি বাঙলা ছবি ছাখেন না বুঝি? এজাতীয় মেয়ে যদি সত্যিই না থাকে, তাহলে তো সব ছবিই বর্‌বাদ। মিথ্যে। যখনই যে-ছবি আমি দেখতে যাই, এই ধরনের মেয়ে দেখতে পাই। এরকম মেয়ে না থাকলে সে-ছবিই অচল। যাক, এই—এই মোটমাট আমার দাবী। এছাড়াও, আরো একটা ছিল, কিন্তু—তা—তা আমি ভাষায় ঠিক প্রকাশ করতে পারছি নে।'

'ইংরিজিতে বলুন।—' আমি বাৎলাই—'কিংবা হিন্দীবাতে, যদি রাষ্ট্রভাষায় বেশি তালিম থাকে। হিন্দী ছবি বহুৎ দেখার অভ্যেস থাকে যদি।'

'মানে, বলছিলাম তার হাসির কথাই। কিন্তু কি বলে সে-হাসিব বর্ণনা দেব? সে-হাসি শুধু সিনেমা ছবিতেই দেখা যায়। আর দেখলে…: দেখলে যে কী হয় তা সে কিছুতেই হাঁসিল কবতে পারে না।

'মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া?' আমি ঘোরালো কথাটাকে সোজা করে আনতে যাই, কিন্তু কথাটা শুনেই আমার মাথা ঘোরে কেমন।

'না, মাথা ঘোরায় না। সোজাই রাখে মাথা। তার দিকেই সোজা-সুজি রাখে। কিন্তু সে এমন এক হাসি—যাব তুলনা হয না। তেমন হাসি শুধু সে-ই হাসতে পারে। এম্‌নি ফিক্ করে হাসা নয়। মেয়েটি যখন তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসবে—মানে, আমার দিকেই—এমন একটা অন্তরঙ্গ ভাবে—তার সারা মুখ কী যেন মায়ায় মেদুর হয়ে আসবে, চোখের দৃষ্টি হবে গাঢ়—তার বড়ো বড়ো দুচোখ আমার মুখের ওপর

রেখে—অপরূপ এমন একখানা হাসি—তাতে এমন এক গদগদ ভাব, সেই সঙ্গে যেন কোন্ অতলস্পর্শী রহস্যের ছোঁয়া লাগানো···

'অসম্ভব।' এত রহস্য আমার ভালো লাগে না।—'এমন মেয়ের পাত্তা পাওয়া আমার অসাধ্য। এহেন পাত্রী কোথ্থাও নেই।'

অমিয়-মন্থ

প্রিসিলা পেন্সিলের শিস্ মুখে দিয়ে শুনছিলো। (ছেলে হলেও এমন মেয়ের কথায় শিস্ না দিয়ে পারতো না।) শিস্ দেয়া রেখে সে বললে—'না। মিলতে পারে এমন মেয়ে। মিললেও মিলতে পারে। তার আগে একটি কথা আমি জানতে চাই। কথাটা শুধাই আমি আপনাকেই। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে এতগুলি দুর্লভ জিনিস যখন আপনি চাইছেন, তখন আপনার নিজের দিকেও তাঁকে দেবার মত এম্‌নি বিরল নিশ্চয়ই কিছু আপনার আছে? সেটা কী— কী কী—আমি জানতে পারি?'

'যদি অনুমতি করেন, তবে বলি —' ছেলেটি নিজের বিবৃতি দেয়: 'লম্বায় আমি পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। শক্ত সমর্থ। ব্যায়ামপুষ্ট দেহ। খেলাধুলার ঝোঁক আছে। তোফা মেজাজ। ঠাণ্ডা। গোলমাল ভালোবাসিনে একদম্। বাড়িতে কোনো ঝামেলা নেই। নিজের

ব্যাবসা আছে। 'চালু ব্যাবসা, বেশ ভালো আয়ের। এখন মাসে হাজার পাঁচেক উপায় হয়। পরে এটা আরো বাড়তে পারে।'

প্রিসিলা হাসলো। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসলো আমার প্রিসিলা। বড়ো বড়ো দু-চোখ তার মুখের ওপর রেখে—যারপরনাই

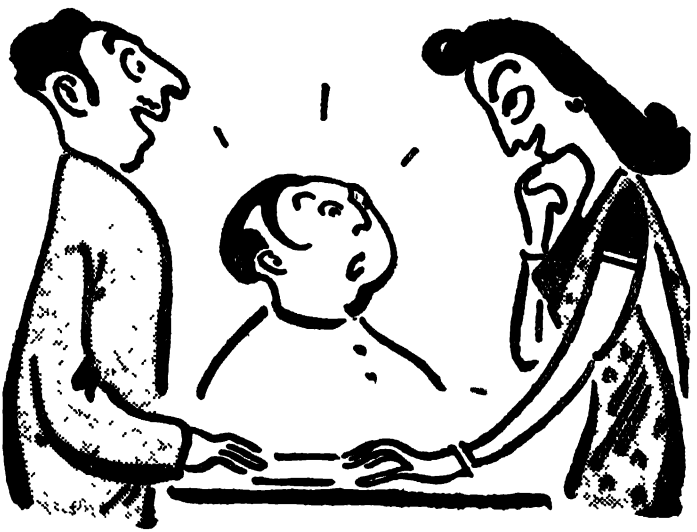

হাসিতেই কাজ হাঁসিল্!

গাঢ় করে—এমন ঐকান্তিক হাসি—যা কোনোদিন আমি দেখিনি। যার কোনো তুলনা হয় না। চক্ষের পলকে সারামুখ কোন্ এক অপরূপ মায়ায় মেদুর হয়ে এলো ওর—অতলস্পর্শী রহস্যের ছায়া পড়লো তার ওপর·····অন্তরঙ্গতার সঙ্গে ওতপ্রোত, বিদ্যুৎ ঝলকের মতই অনির্বচনীয় সেই হাসি·····যার গদগদ ভাবটা গঁদের মতই ঘনীভূত

আর আঠালো……ছোঁয়াচে রোগের মতন মারাত্মক এই……এমন একখানা হাসি যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কটকালীন ইস্টকের মতই সে সযত্নে নিজের স্টকে জমিয়ে রেখেছে তা আমার জানা ছিল না।

'এই তো ! এই তো সেই !' লাফিয়ে ওঠে ছেলেটি। (অমন হাসির চোট সামলাতে পারে না। না পারার কথাই ! আমার মাথায় লাগেনি, তাইতেই তা ঘুরে গেছল।) উত্তেজিত হয়ে সে বলে — 'পেয়েছি। পেয়ে গেছি। এই মেয়েকেই তো আমি য়্যাদ্দিন খুঁজছিলাম।'

'আরে, আরে —!' আমি বাধা দিয়ে বলতে যাই। আরে, এ বলে কী !

'আমার পাত্রী আমি পেয়ে গেছি মশাই !' সে বাধার ওপরে বাধা দেয়।—'এখন ওঁর যদি কোনো আপত্তি না থাকে—'

'না, আপত্তি কিসের !' প্রিসিলার জবাব শুনি—'তাহলে—তাহলে আমি বলি কি, কী নাম বললেন আপনার ?' বলতে গিয়ে সে শুধায়। সুধাকণ্ঠেই। যদিও সুমধুর স্বরের কোনো ফরমাস ছিল না ছেলেটার। শুধু এমনি আওয়াজেই চলতো।

'অমিয়। অমিয়কান্তি ভরদ্বাজ।'

'তাহলে চলুন অমিয়বাবু, কফি-হাউসে কি কোথাও আমরা যাই। সেখানে বসে সব ঠিকঠাক করা যাক—কেমন ?' সে উঠে দাঁড়ায়।

'তার মানে ?' চোখ তুলে তাকাই আমি।

বিবাহ-ঘটক-কার্যালয়ের ঘাড় দিয়েই যে প্রথম চোট যাবে, এমন দুর্ঘটনা—কিম্বা দুর্ঘটকতা, যাই বলুন—এখানেই, আমার চোখের ওপরেই ঘটবে, তা আমার ধারণায় আসে না।

আমি বাধা দিতে চাই—সবলে নয়—এমন কিছু বলে'—যাতে ওর টনক নড়ে। কিন্তু বাক্‌সর্বস্ব আমাকেও যেন অবাক করে দেয়।

সর্বস্বান্ত হতে হয়। বলার কিছু ভেবে পাইনে। অমিয় গরল ভেল—কথাটা আমার মনে পড়ে। পদাবলীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে বিপদাবলীর কথাও মনে আসে। অমিয়—এহেন অমিয়ও গরল হতে পারে, ভেল হতে পারে। ভোল বদ্‌লে গাড়োল হয়ে দেখা দিতে পারে। কতো আপাতমধুর সম্বন্ধও উৎপাত হয়ে ওঠে, ভ্যাজাল দেখা দেয় তার। পরের দশায়, কটু-তিক্ত-কষায় হয়ে—বিষিয়ে উঠে বিষম হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু শোনার অপেক্ষা নেই প্রিসিলার। সে আর দাঁড়ায় না—

'তুমি কিচ্ছুটি ভেব না মেজমামা। তোমার ঘটকবিদায় তুমি পাবেই—' চলতে চলতে বলে, বলতে বলতে চলে যায়—'এ-আপিস এর পর আর না চালালেও চলবে তোমার। বিয়েটা ঘটা করেই হোক বা তিন আইনেই হোক—ঘটকালি তোমার মারা যাবে না জেনো।'